প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?

গবেষণা সিরিজ-১৯

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৫
চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ
কিউ আর এফ

নির্ধারিত মূল্য : ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আনিকা প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
ফকিরাপুল, ঢাকা।

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৭
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১১
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহ চিত্র (নীতিমালা)	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ	২৬
৭	হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তন ধারা	২৬
৮	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞা ও তার পর্যালোচনা	৩৯
৯	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা	৪০
১০	হাদীসশাস্ত্রে থাকা ‘হাদীস’ শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতা ও তার পর্যালোচনা	৫০
১১	হাদীসের বিভিন্ন অংশ	৫১
১২	হাদীস জালকরণ	৫১
১৩	জাল হাদীস তৈরীর কারণ	৫৩
১৪	জাল হাদীস প্রচারের পদ্ধতি	৫৪
১৫	জাল হাদীস তৈরীর পরিমাণ	৫৪
১৬	হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের কারণ	৫৫
১৭	হাদীসের পরিভাষার বিবর্তনের ক্রমধারা	৫৫
১৮	সহীহ হাদীস	৫৮
১৯	সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার কুফল	৫৯
২০	প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা	৫৯
২১	‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস না বুঝানোর দলিলসমূহ	৬১
২২	প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বাছাই পদ্ধতির দুর্বলতা এবং তার কুফল	৬৫
২৩	প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত ‘সহীহ হাদীস’পরিভাষাটির নাম পরিবর্তন	৭০
২৪	বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে ‘প্রকৃত সহীহ হাদীস’এর সংকলন রচনা	৭১
	ক. বর্তমান ‘সহীহ’ ও ‘যঈফ’ হাদীসের মতন যাচাই করে প্রকৃত সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা	৭২
	খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য	৭৭

	গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ	৭৯
	ঘ. প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি	৭৯
	ঙ. প্রচলিত 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করার ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/ মূলনীতি	৮০
২৫	শেষ কথা	৮১

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

ইসলামে, 'হাদীস' জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। 'হাদীস' না হলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো- কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। উৎস তিনটির মধ্যে Common sense-এর ভূমিকা দারোয়ান তূল্য। জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে উৎস তিনটির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান মুসলিম সমাজে Common sense জ্ঞানের উৎস হিসেবে চালু নেই। এর ফলে দারোয়ান না থাকায় ইসলামের ঘরের অনেক মূল তথ্য চুরি হয়ে গিয়েছে।

মানব সভ্যতার শত্রু ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা যে পদ্ধতিতে Common sense কে ইসলামী জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে সে একই কর্মনীতির মাধ্যমে তারা হাদীসকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে আহলুল কুরআন নামের একটি দল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। এরা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে হাদীস সম্পর্কিত চালু দু'টি কথা আহলুল কুরআনদের সমর্থক সংগ্রহে দারুনভাবে সাহায্য করছে। কথা দু'টি হলো-

১. (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না

২. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে।

এ কথা দু'টি অবশ্যই যেকোনো Common sense/বিবেক সম্পন্ন মুসলিমকে হাদীসের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ করে তুলবে এবং তুলছে। আর এ মানুষগুলোর অনেকে আহলুল কুরআনদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। আহলুল কুরআনরা সফল হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মানব কল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাবে। ফলে মানব সভ্যতা অপরিসীমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের হাদীসপ্রিয় অসংখ্য আলিম ও সাধারণ মানুষ এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত নন। তাই তারা প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারমূলক যেকোনো কথা শুনলে তাকে হাদীসের বিরুদ্ধ কথা মনে করেন।

আশা করা যায় পুস্তিকায় উল্লেখিত তথ্যগুলো জানার পর প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে উল্লেখ থাকা 'হাদীস' ও 'সহীহ হাদীস' সম্পর্কে প্রকৃত তথা মুসলিম জাতি জানতে পারবে। ফলে যারা যথাযথ অবস্থানে আছেন তারা প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারের দিকে জরুরীভিত্তিতে এগিয়ে আসবেন এবং হাদীসকে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়ার বিষয়ে ভূমিকা রাখবেন।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক) অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১ অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান

মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ২৮.০৪.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
২৮.০৪.২০০৪ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জিবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভিতরে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense–এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের নিকট উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহি দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কিনা এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের নিকট থেকে সরাসরিভাবে তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ: (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের শেষটি। আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না/জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ৩নং তথ্যের আয়াত ক'খানির মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করল সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা: ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যম মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: Common sense কে যথাযথভাব কাজে লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরনের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: অব্যবহিত পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْبُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: হাদীসটির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুক ইহুদী খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তীত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي ..... فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* ওয়াবেসা (রা.) বলেন -... ... ... এরপর রাসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রাসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) الشَّامِيِّينَ (য়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

ব্যাখ্যা: নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুন:জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল ! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মন কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উৎস।

সম্মিলিতি শিক্ষা: হাদীস তিনটিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.....

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, **যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।**

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াত বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে, প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মণীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর **কিয়াস** হলো- কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense -এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক

হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি/নীতিমালা মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**কুরআন, সুন্নাহ ও** Common sense **ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্রটি/নীতিমালা**' নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

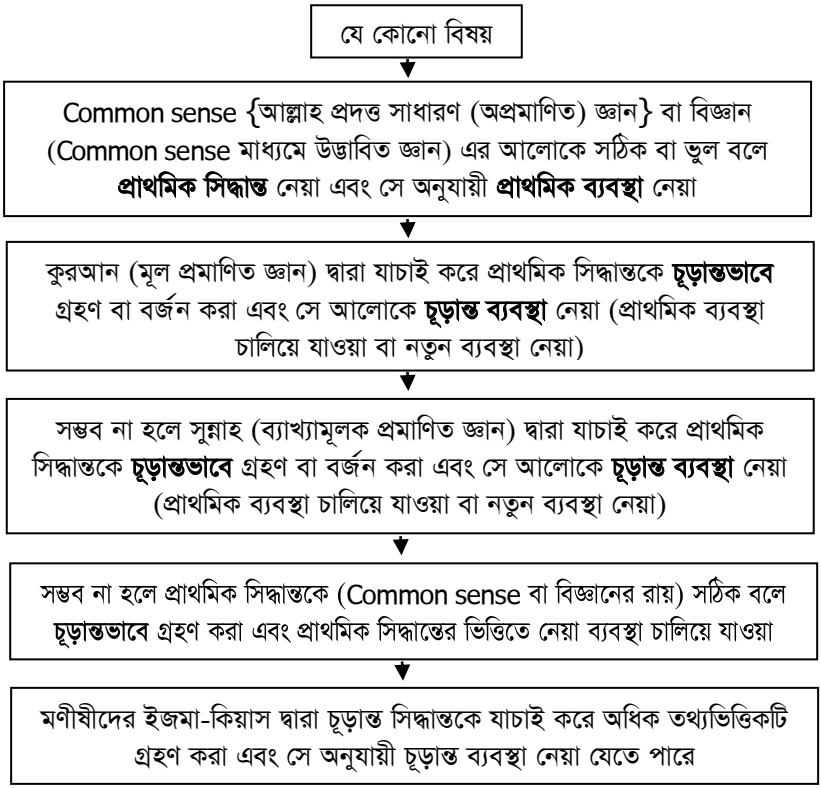

মূল বিষয়

ইসলামী জীবন বিধানে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো- কুরআন সুন্নাহ ও Common sense। বিজ্ঞান (Science) হলো Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য হলো- কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। অন্যদিকে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য হলো- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা), মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী। সুন্নাহ (রাসূল স.), মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আর Common sense, মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান। উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বোঝা যায় জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির গুরুত্বের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তবে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হলে উৎস তিনটির যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

বর্তমান মুসলিম সমাজে Common sense জ্ঞানের উৎস হিসেবে চালু নেই। এর ফলে দারোয়ান না থাকায় ইসলামের ঘরের অনেক মূল তথ্য চুরি হয়ে গিয়েছে। মানব সভ্যতার শত্রু ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা যে পদ্ধতিতে Common sense কে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেয়াতে সক্ষম হয়েছে তা হলো- প্রথমে মু'তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, সময়কাল: ৮০-১৩১ হিঃ) নামের একটি দল তৈরি করা হয় এবং তাদের দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে Common sense-কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়। অর্থাৎ মু'তাজিলাদের দ্বারা প্রচার করানো হয়- কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-এর দ্বন্দ্ব হলে কুরআন ও সুন্নাহর রায় বাদ দিয়ে Common sense-এর রায়কে গ্রহণ করতে হবে। এ কথায় সকল মুসলিম যখন ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের দ্বারা Common sense জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়'- কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তা এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এটি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো- If you want to kill a good dog give him a bad name and then kill him. বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক বইটিতে।

একই কর্মনীতির মাধ্যমে ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা হাদীসকে ইসলামের জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বর্তমানে

আহলুল কুরআন নামের একটি দল দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে। এরা কুরআন মানে কিন্তু হাদীস মানে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে হাদীস সম্পর্কিত চালু দু'টি কথা আহলুল কুরআনদের সমর্থক সংগ্রহে দারুনভাবে সাহায্য করছে। কথা দু'টি হলো-

১. (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না

২. হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে।

এ কথা দু'টি যেকোনো Common sense/বিবেক সম্পন্ন মুসলিমকে অবশ্যই হাদীসের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্ধ করে তুলবে এবং তুলছে। আর এ মানুষগুলোর অনেকে আহলুল কুরআনদের দলে ভিড়ে যাচ্ছে। আহলুল কুরআনরা সফল হলে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির মানব কল্যাণমূলক অসংখ্য কথা হারিয়ে যাবে। ফলে মানব সভ্যতা অপরিসীমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের হাদীসপ্রিয় কোটি কোটি আলিম ও সাধারণ মানুষ এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত নন। তাই তারা প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের সংস্কারমূলক যেকোনো কথা শুনলে তাকে হাদীসের বিরুদ্ধ কথা মনে করে।

হাদীস ও সহীহ হাদীস সম্পর্কে আমার ধারণাও সাধারণ মুসলিমদের মতো ছিল। কিন্তু (প্রচলিত) সহীহ হাদীস কুরআনের বিপরীত হলেও তা মানতে হবে বা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না এবং হাদীস কুরআনকে রহিত করতে পারে কথা দু'টি আমাকে গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীস পড়তে বাধ্য করে। পড়তে গিয়ে দেখি প্রচলিত কথা দু'টি সঠিক না হওয়ার বিষয়ে সকল হাদীসগ্রন্থে অনেক তথ্য আছে। কিন্তু সে তথ্যগুলোকে সামনে আনা হয়নি। তথ্যগুলো সামনে থাকলে হাদীস সম্পর্কে বিধ্বংসী কথা দু'টি কোনোক্রমেই চালু হতে পারতো না।

এ কথাগুলো সামনে রেখে বইটিকে পড়ার জন্য সকল পাঠকের নিকট অনুরোধ রইল। আশা করি বইটি পড়ার পর-

১. হাদীস ও (প্রচলিত) সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সকল মানুষ পেয়ে যাবে

২. হাদীস নিয়ে আরো কাজ করার জন্য অনেক মুসলিম এগিয়ে আসবেন

৩. আহলুল কুরআনগণ হাদীসকে জ্ঞানের উৎস এবং আমল থেকে বাদ দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে গঠনমূলকভাবে হাদীসের সংস্কারমূলক কাজ আরম্ভ করবেন।

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ

আরবী অভিধানে হাদীস শব্দের নিম্নোক্ত অর্থসমূহ পাওয়া যায়:

- কথা
- বাণী
- বক্তব্য
- খোশ-গল্প
- উপন্যাস
- উপকথা
- প্রচার করা
- নতুন
- আধুনিক

হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তন ধারা

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝা সহজ হবে যদি হাদীসের সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থার বিবর্তন ধারাটি সামনে থাকে। তাই চলুন প্রথমে এ বিষয়টি জানা যাক। বিষয়টি নিম্নলিখিত উপধারায় আলোচনা করা হবে-

১. রাসূল (স.) এর মক্কী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
২. রাসূল (স.) এর মাদানী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ সংকলন ও প্রচার পদ্ধতি
৪. সাহাবীদের যুগ প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
৫. হিজরী ১ম শতকের শেষ থেকে ২য় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
৬. হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি থেকে ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
৭. হিজরী ৫ম শতক থেকে বর্তমান কাল (২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা
৮. ভবিষ্যতে হাদীস সংগ্রহ

চলুন এখন প্রতিটি উপধারার প্রকৃত অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেয়া যাক-

১. রাসূল (স.) এর মাক্কী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

নবুয়াতের শুরু থেকেই কুরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূল (স.) নিজের তত্ত্বাবধানে তা লিখে রাখার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শুরু থেকে যতো দিন পর্যন্ত মুসলিমরা বর্ণনা ভঙ্গি, উপস্থাপন পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি দেখে কোনটি কুরআনের আয়াত আর কোনটি তা নয়, এটি বুঝার যোগ্যতা অর্জন করেনি ততোদিন পর্যন্ত হাদীস লিখতে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন। এটি তিনি করেছিলেন কুরআনের সাথে তাঁর কথা মিশে যাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের

অকল্পনীয় ক্ষতি এড়ানোর জন্যে। হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য পাওয়া যায় তার একটি হচ্ছে-

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহঃ) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার উপর মিথ্যারোপ করে- হাম্মাম (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক। তাছাড়া হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। অতএব হাদীসটির মতন সহীহ।
- *সহীহ মুসলিম,* আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিসাপুরী, كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ (যুহুদ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা অধ্যায়), بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (ধীর-স্থীরভাবে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইলম লিপিবদ্ধ করার হুকুম পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩০০৪, পৃ. ৮৪৯।

রাসূল (স.) এর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞার কারণে মক্কী জীবনে হাদীস লিখে সংরক্ষণ করা হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তখন হাদীস সংরক্ষণের একমাত্র উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আর হাদীস প্রচারের একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার।

২. রাসূল (স.) এর মাদানী জীবনে হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

হিজরতের পর তথা নবুয়াতের ১৩-১৪ বছর পর মুসলমানরা যখন কুরআন ও হাদীসের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তখন রাসূল (স.) হাদীস লেখার সাধারণ অনুমতি দেন। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এর কয়েকটি হাদীসের একটি হচ্ছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ، وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

অনুবাদ: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, আমি নবী করিম (স.) হতে শোনা প্রতিটি কথা সংরক্ষণের জন্যে লিখে নিতাম। এটি দেখে কুরাইশ সাহাবীগণ আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। আমাকে তাঁরা বলেন, তুমি রাসূল (স.) এর মুখে যা শুনো তা সবই লিখে রাখ? অথচ রাসূল (স.) একজন মানুষ। তিনি কখনও সন্তোষ এবং কখনও রাগের মধ্যে থেকে কথা বলেন। অতঃপর আমি হাদীস লেখা বন্ধ করে দেই এবং একদিন রাসূল (স.) এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করি। রাসূল (স.) এ কথা শুনার সাথে সাথে নিজের দুই ঠোঁটের দিকে ইশারা করে বললেন- তুমি লিখতে থাক। যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, আমার এই মুখ হতে প্রকৃত সত্য কথা ছাড়া কিছুই বের হয় না। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং- ৩৬৪৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৫১০)

এ ধরনের কিছু হাদীস থেকে জানা যায় মাদানী জীবনে রাসূল (স.) হাদীস লেখার সাধারণ অনুমতিই শুধু দেননি হাদীস লেখার পথে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তিনি তা দূর করে দিতেন। রাসূল (স.) এর অনুমতি ও উৎসাহ পেয়ে এবং হাদীস নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করে যে সকল সাহাবী লেখাপড়া জানতেন (অতি অল্প সংখ্যক) তারা বিচ্ছিন্নভাবে হাদীস লিখে নিজ সংগ্রহে রেখে দিতেন- এ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থিত আছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেও রাসূল (স.) বিভিন্ন সাহাবীর দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। তবে রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় যেখানে কুরআন সংকলিত হয়নি সেখানে হাদীস সংকলিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

♣♣ মোটকথা রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থকরণ এবং হাদীস প্রচারের প্রধান বা প্রায় একমাত্র উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের সময় সাহাবীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১,১৪,০০০ (এক লাখ চৌদ্দ হাজার)।

(আল হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃষ্ঠা-১৩২)

এই ১,১৪,০০০ সাহাবীর সকলের পক্ষে সব সময় রাসূল (স.) কাছে থেকে তাঁর সকল কথা শুনা বা সকল কাজ দেখা সম্ভব ছিল না। তাই অধিকাংশ সাহাবীর জানা থাকা হাদীসের মধ্যে কিছু ছিল রাসূল (স.) এর নিকট থেকে সরাসরি শুনা বা দেখা আর কিছু ছিল অন্য সাহাবীর (রা.) নিকট থেকে শুনা বা দেখা। এ দুয়ের অংশ এক এক সাহাবীর জন্যে এক এক রকম ছিল।

(তাবাকাতে ইবনে সাদ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৩)

৩. খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ সংকলন ও প্রচার পদ্ধতি

রাসূল (স.) যতদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন কারো পক্ষে তাঁর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করা, রাসূলের কথাকে তাঁর কথা নয় বলে উড়িয়ে দেয়া এবং রাসূল (স.) এর কোনো কথার অপব্যাখ্যা করে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ ছিল না। কারণ, তেমন কিছু ঘটলেই সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূল (স.) এর নিকট জিজ্ঞাসা করে সহজেই তার সমাধান করে নিতে পারতেন। কিন্তু রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের পর এই অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটে। একদিকে ওহীর জ্ঞান লাভের সূত্র ছিন্ন হয়ে যায় অন্যদিকে অনেক নও-মুসলিম ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। কিছু মুনাফিকও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা রাসূল (স.) এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করারও চেষ্টা করে।

প্রথম খলিফার সময়কাল

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মাথাচাড়া দিয়ে উঠা মুনাফিক ও মুরতাদদের কঠোর হস্তে দমন করেন। হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করেন। বর্ণিত কোনো হাদীসের সত্যতা প্রমাণিত না হওয়ার আগে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। তবে তিনি যে কুরআনের পরেই হাদীসের গুরুত্ব দিতেন তা স্পষ্ট বুঝা যায় খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর দেয়া প্রথম ভাষণ থেকে। সেখানে তিনি বলেছিলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وُلِّيْتُ اَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلَكِنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّنَنَ فَعَلَّمَنَا فَعَلِمْنَا .

অনুবাদ: হে লোকগণ, আমাকে তোমাদের (রাষ্ট্রের) দায়িত্বশীল বানানো হয়েছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে

এবং নবী করীম (স.) তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি আমাদের এই উভয় জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমরা তা শিখে নিয়েছি।

(তাবাকাত ইবনে সা'দ: তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৯)

আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজে ৫০০ (পাঁচশত) হাদীসের এক সংকলন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তিনি নিজেই তা নষ্ট করে দেন। এর কারণ হিসেবে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন-

১. তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর সংকলিত হাদীসে একটি শব্দও যদি রাসূল (স.) এর মূল বাণীর বিন্দুমাত্র বিপরীত হয়ে পড়ে তবে রাসূল (স.) এর সতর্কবাণী অনুযায়ী তাঁকে জাহান্নামের ইন্ধন হতে হবে।

২. তাঁর মনে এ ভয়ও জাগ্রত হয় যে, তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থকে মুসলিম জনগণ যদি কুরআনের সমতুল্য মর্যাদা দিয়ে বসে বা অন্য সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দিতে শুরু করে, তা হলে ইসলামের বিশেষ ক্ষতি হবে।

(তারিখি খুলাফা ফিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা-৬৩)

দ্বিতীয় খলীফার সময়কাল

দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রা.)এর দৃষ্টিতেও ইসলামের ভিত্তি হিসেবে কুরআনের পরই ছিল সুন্নাহ তথা রাসূল (স.) এর হাদীসের স্থান। তিনি অনেক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন শাসকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং সর্বসাধারণ্যে সেসবের ব্যাপক প্রচার করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। ইলমে হাদীসের শিক্ষা ব্যাপকতর করার জন্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও করেন।

(আঝলাতুল হুফফাজ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬)

কিন্তু জাল হাদীসের মারাত্মক কুফল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে তিনিও আবু বকর (রা.) এর ন্যায় হাদীস বর্ণনা ও গ্রহণের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেন। আবু মুসা আশআরী (রা.) এর বর্ণিত একটি হাদীসের সত্যতা প্রমাণের জন্যে তিনি তাঁকে বলেছিলেন-

لَتَأْتِيَنِّيْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ.

অনুবাদ: দলিল পেশ কর নইলে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

(তাজকিরাতুল হুফফাজ,খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮ এবং আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃষ্ঠা-৮০)

পরে তার সমর্থনে অপর এক সাহাবীকে পেশ করা হলে তিনি আশ্বস্ত হন।

ওমর ফারুক (রা.) এর সময় বিচ্ছিন্ন থাকা হাদীস সম্পদ সংকলন করার প্রশ্ন প্রথম উত্থাপিত হয়। ওমর (রা.) নিজেই এ বিরাট কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন

এবং বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শ করেন। মুসলমানরা তাঁর অনুকূলেই পরামর্শ দেন। কিন্তু পরে তাঁর নিজের মনে এ সম্পর্কে দ্বিধা ও সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় এক মাস ধরে চিন্তা-ভাবনা ও ইস্তেখারা করেন। পরে তিনি নিজেই একদিন বললেন-

اِنِّىْ كُنْتُ ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ كِتَابَةِ السُّنَنِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ . ثُمَّ تَذَكَّرْتُ فَاِذَا اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ قَدْ كَتَبُوْا مَعَ كِتَابِ اللهِ كُتُبًا فَاَكَبُّوْا عَلَيْهَا وَتَرَكُوْا كِتَابَ اللهِ وَ اِنِّىْ وَاللهِ لاَ اُلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ فَتَرَكَ كِتَابَ السُّنَنِ .

অনুবাদ: আমি তোমাদের হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম এ কথা তোমরা জান। কিন্তু পরে মনে পড়লো তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাবের কিছু লোক আল্লাহর কিতাবের সাথে তাদের নবীর কথা সংকলিত করে কিতাব রচনা করেছিল। অতঃপর আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করে তার প্রতি ঝুকে পড়েছিল। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোনো কিছু মিশাবো না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।
(মুকাদ্দামুতু তানভীরুল হাওয়ালী- শরাহ মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃষ্ঠা-২; তকিয়াদুল ইলম, পৃষ্ঠা-৫০; জামেউ বায়ানিল ইলম, পৃষ্ঠা-৬৪; কানজুল উম্মাল, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৯)

বস্তুত সুসংবদ্ধ ও সংকলিত হাদীস গ্রন্থ পেয়ে লোকেরা হয়তো কুরআন থেকে তাকে বেশি গুরুত্ব দিবে এবং কেবল হাদীস অনুযায়ীই চলতে শুরু করবে, শুধুমাত্র এ ভয়েই ওমর (রা.) হাদীস সংকলনের কাজ পরিত্যাগ করেন। তিনি এটাকে যে নাজায়েয মনে করতেন না, তা তাঁর পূর্বোল্লিখিত কার্যকলাপ থেকে সহজে জানা ও বুঝা যায়।

তৃতীয় খলীফার সময়কাল

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)- এর বর্ণনা করা হাদীসের সংখ্যা কম থাকার বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য হচ্ছে-

مَا يُمْنِعُنِىْ اَنْ اُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ اَكُوْنَ اَوْعَى اَصْحَابِهِ عَنْهُ وَلَكِنِّىْ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ قَالَ عَلَى مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

অনুবাদ: রাসূল (স.) এর সাহাবীদের মধ্যে আমি কম হাদীস জানি, এটি রাসূল (স.) এর হাদীস বর্ণনা থেকে আমার বিরত থাকার কারণ নয়। আসল কারণটি হচ্ছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নিজেই রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যে, আমি

যা বলিনি যদি কেউ তা আমার কথা হিসেবে বর্ণনা করে তবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

(তাবকাতে ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠ-৩৯; মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫)

তাই হযরত উসমান (রা.) এর বর্ণনা করা কয়েকটি মাত্র হাদীস পাওয়া যায়।

চতুর্থ খলীফার সময়কাল

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.) হচ্ছেন সে ক'জন সাহাবীর মধ্যে একজন যাঁরা নিজ হাতে রাসূল (স.) এর হাদীস লিখে রেখেছিলেন। তাঁর লিখিত হাদীস ভাঁজ করে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপে রেখে দিয়েছিলেন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-৪৬৯; জামে বয়ানুল ইলম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭২; মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬১)

৪. সাহাবীদের যুগ প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (১ম হিজরী শতকের শেষ পর্যন্ত) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা:

খুলাফায়ে রাশেদার শেষ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে নানাবিধ ফেতনার সৃষ্টি হয়। শিয়া ও খাওয়ারিজ দু'টি ফিরকা স্থায়ীভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা হাদীস বানিয়ে রাসূল (স.) এর নামে চালিয়ে দেয়ারও চেষ্টা করে। তাই হাদীস পেলে মুনাফিকরা তা বিকৃত করে প্রচার করে ক্ষতি করতে পারে বা মুসলমানরা কুরআন বাদ দিয়ে হাদীসের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়তে পারে এসব কারণে সাহাবায়ে কিরামগণ সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা ও প্রচার সাময়িকভাবে প্রায় বন্ধ রাখেন। শরীয়াতের মাসআলা-মাসায়েলের মীমাংসা কিংবা রাষ্ট্র শাসন ও বিচার-আচার প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে যখন হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়তো কেবলমাত্র তখন তারা পরস্পরের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে এ সময় হাদীসের বিরাট সম্পদ বক্ষে ধারণ করে অসংখ্য সাহাবী অতন্দ্র প্রহরীর মত উপস্থিত ছিলেন।

দিন যত যেতে থাকে মুসলিম সমাজে ততো নিত্য নতুন পরিস্থিতি ও সমস্যার উদ্ভব হতে থাকে। মুসলিম জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূল (স.) এর কথা জানা জরুরী হয়ে পড়ে। ফলে জীবিত সাহাবীগণ তাদের জানা থাকা হাদীস বর্ণনা করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে ইলমে হাদীস অর্জন করার প্রবল আগ্রহ জন্মে। তারা সাহাবীদের নিকট নানাভাবে রাসূল (স.)- এর হাদীস শুনার আবদার শুরু করেন। এ কারণেও সাহাবায়ে কিরাম তাদের স্মরণে বা লিখে রাখা হাদীস প্রকাশ করতে এবং শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হন। এ সময়ে বহু তাবেয়ী, সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস লিখে তা সংরক্ষণ ও প্রচারে লিপ্ত হন। হাদীস যথাযথভাবে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের কাজ এ পর্যায়ে কেউ করেছেন বলে

ইতিহাসে কোনো নজীর পাওয়া না গেলেও হাদীসের যে সকল লিখিত দলিল উপস্থিত থাকার কথা ইতিহাস থেকে জানা যায় তার কয়েকটি হচ্ছে-

১. সহীফায়ে সাদেকা- হযরত আবদুল্লাহ আমর ইবনুল আস (রা.) এর লিখিত দস্তাবেজ। (ইন্তেকাল ৬৩ হিজরী)
২. সহীফায়ে আলী (রা.)
৩. রাসূল (স.) এর লিখিত ভাষণ
৪. সহীফায়ে জাবির (রা.)
৫. সহীফায়ে সহীহা
৬. সহীফায়ে আনাস ইবনে মালেক (রা.)
৭. মাকতুবাতে নাফে (রহ.)

মোটকথা সাহাবীগণের সময়কাল প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত (সর্বশেষ সাহাবী ইন্তেকাল করেন ১১০ হিঃ সনে)

(আবু দাউদের ভুমিকা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০)

হাদীস সংরক্ষণের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থ রাখা। আর হাদীস প্রচারের প্রধান উপায় ছিল মৌখিক প্রচার। একজন সাহাবী অন্য একজন সাহাবী বা একজন তাবেয়ী একজন সাহাবীর নিকট থেকে সরাসরি রাসূল (স.) এর হাদীস শোনার জন্যে অকল্পনীয় কষ্ট করে অনেক দূর ভ্রমণ করেছেন, এমন বহু ঘটনা হাদীস গ্রন্থ ও ইতিহাসে উপস্থিত আছে।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা-৮৭)

৫. হিজরী ১ম শতকের শেষ থেকে ২য় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা

এ সময়কালে তাবেয়ীদের এক বিরাট দল হাদীস সংগ্রহ, লিখন ও প্রচারের কাজে লেগে যায়। তাবেয়ী হচ্ছেন সেই মুমিনগণ যারা জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কিছু সময় তাঁর সাথে কাটিয়েছেন এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন। একমাত্র হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) এর নিকট ৮০০ (আটশত) তাবেয়ী হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন। সাহাবীগণ যেমন রাসূল (স.) এবং পরস্পরের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন, হাজার হাজার তাবেয়ী তেমনি সাহাবী ও অপর তাবেয়ীর নিকট থেকে হাদীস শিখেছেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়িব (মৃঃ ৯৩ হিঃ), ইবনে সীরীন (মৃঃ ১১০ হিঃ), নাফে (মৃঃ ১১৭ হিঃ), জয়নুল আবেদীন, মুজাহিদ, মাসরুক, মাকহুল (মৃঃ১১৮ হিঃ), ইকরামা (মৃঃ১০৫ হিঃ), আতা (মৃঃ১১৫ হিঃ), কাতাদাহ (মৃঃ ১১৭ হিঃ), শাবী (মৃঃ ১০৫ হিঃ), আলকামা, ইব্রাহীম নখঈ (মৃঃ ৯৬ হিঃ), ওমর বিন আবদুল আজিজ (মৃঃ ১০১ হিঃ) প্রমুখ প্রবীণ তাবেয়ীগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে সকল সাহাবী ১১০

হিজরীর মধ্যে ইন্তেকাল করেন। তাই সহজেই বুঝা যায়, অনেকে তাবেয়ী সাহাবীদের দীর্ঘ সহচর্য লাভ করেন।

তাবেয়ীদের মধ্যে সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভকারী তাবেয়ী হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (জন্ম ৬১ হিঃ, মৃত্যু ১০১ হিঃ), ৯৯ হিজরী সালে খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতের মেয়াদ ছিল দুই বছর পাঁচ মাস। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার কারণে তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের পঞ্চম খলিফা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলামী জীবন-যাপন ও খিলাফত পরিচালনার জন্যে হাদীস এক অপরিহার্য সম্পদ। সাহাবায়ে কিরামের প্রায় সকলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। অধিকাংশ তাবেয়ীও দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যারা বেঁচে আছেন তারাও আর বেশি দিন থাকবেন বলে মনে হয় না। অতএব অনতিবিলম্বে এই মহান সম্পদ সংগ্রহ ও সংকলন একান্ত দরকার। এটি ভেবেই তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্ত ফরমান লিখে পাঠান-

اُنْظُرُوا حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَاجْمَعُوْاهُ.

অনুবাদ: রাসূল (স.) এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি দাও। তা সংগ্রহ-সংকলন কর।

(ফাতহুল বারী,পৃষ্ঠা-৩, মুয়াত্তা মালিক, পৃষ্ঠা-২)

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাযমকেও তিনি নিম্নোক্তভাবে ফরমান লিখে পাঠান-

اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) اَوْ سُنَّتِهِ اَوْ حَدِيْثِ عُمَرَ اَوْنَحْوِ هَذَا فَاكْتُبْهُ لِيْ فَاِنِّيْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَ ذِهَابِ الْعُلَمَاءِ.

অনুবাদ: রাসূল (স.) এর হাদীস বা তাঁর সুন্নাহ অথবা হযরত ওমরের বাণী কিংবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্যে লিখে নাও। কেননা আমি হাদীস সম্পদের ও ইলমে হাদীসের ধারকদের বিলুপ্তির ভয় পাচ্ছি।

(সুনানুদ দারিমী, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৯৩৬)

তিনি আরও লিখেন-

وَلاَ يُقْبَلُ اِلاَّ حَدِيْثَ النَّبِيِّ (ص) وَلِيَفْشُوْا الْعِلْمَ وَلِيُجْلِسُوْا حَتَّى يُعْلَمَ فَاِنَّ الْعِلْمَ لاَ يَهْلِكُ حَتَّى يَكُوْنَ سِرّاً.

অনুবাদ: আর রাসূল (স.) এর হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করো না। লোকেরা যেন ইলমে হাদীসকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে এবং হাদীস শিক্ষা

দানের জন্যে মজলিস করে। যেন যারা জানে না তারা শিখে নিতে পারে। কারণ, জ্ঞান গোপন করলে তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

(আল-মাকতাবুশ শামেলাহ: বুখারী ১ম খণ্ড, হাদীস নং ৩১)

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাবেয়ী ইমাম জুহরীকে বিশেষভাবে হাদীস সংকলনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।
(আল-জামেউ বয়নিল ইলম ওয়া ফাযলিহী, তবাকাতে ইবনে সা'দ, পৃষ্ঠা-৩৩৬)

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের ফরমান জারি করার পর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না (মৃত : ১০১ হিঃ)। কিন্তু তাঁর ফরমানের ফলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের যে প্রবাহ শুরু হয়েছিল তা পরের কয়েকশত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাবেয়ীগণ বিভিন্ন শহরে উপস্থিত থাকা সাহাবী বা তাবেয়ীদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্যে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতেন।

তাবেয়ী যুগে হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের যে ক্রমপদ্ধতি ছিল তার সংক্ষিপ্তসার হল-

اَوَّلُ الْعِلْمِ الإِسْتِمَاعُ ثُمَّ الإِنْصَاتُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشْرُ .

অনুবাদ: প্রথমে শ্রবণ করা হতো, পরে তাতে মনোযোগ দেয়া হত, তারপর মুখস্থ করা হত, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল শুরু হত এবং তারপর তা প্রচার করা হত।

(আল-জামেউ বয়ানিল ইলম ওয়া ফাজলিহী, পৃষ্ঠা-১১৮)

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদের যুগের ন্যায় তাবেয়ী যুগেও হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রধান উপায় ছিল মুখস্থকরণ ও মৌখিক প্রচার।

হিজরী ২য় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীনদের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবেয়ীদের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্রিত করতে থাকেন। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এর সরকারি ফরমান এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ যুগেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক কিতাবুল আসার নামক একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। মুসলিম উম্মাহর নিকট উপস্থিত থাকা হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থ। ইমাম আবু হানীফার পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকের দ্বারা হাদীস সংগৃহীত ও লিখিত হয়েছিল কিন্তু ঠিক গ্রন্থ প্রণয়নের ধারায় হাদীসের কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। কিতাবুল আসার-এর পরপরই সংকলিত হয় ইমাম মালিক (রহ.) এর মুয়াত্তা।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন তাবে-তাবেয়ীন হচ্ছেন-ইমাম আবু হানীফা (জন্ম ৮০ হিঃ), ইমাম মালিক (৯৩-১৭৯ হিঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (মৃঃ ১৮৩ হিঃ), ইমাম মুহাম্মাদ শায়বানী, ইমাম আওযায়ী (মৃঃ ১৫৭ হিঃ), ইমাম শুবা, ইমাম সুফিয়ান

সাওরী (৯৭-১৬১ হিঃ), ইমাম লাইস ইবনে সায়াদ (৯৪-১৬৫ হিঃ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১০৭-১৯৮ হিঃ), ইমাম ইবনে জুরাইজ (৮০-১৫০ হিঃ), ইবনে আমের।

৬. হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি থেকে ৪র্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা:

এ যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাপকতা লাভ করে। এ যুগের প্রসিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে-

১. মুসনাদ প্রণয়ন

তৃতীয় হিজরী শতকের প্রথম ভাগে 'মুসনাদ' নামক হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। মুসনাদ বলা হয় সেই ধরনের হাদীস গ্রন্থকে যেখানে এক এক জন সাহাবীর বর্ণনা করা সকল হাদীস বিষয়বস্তু নির্বিশেষে একত্রিত করে উল্লেখ করা হয়। এখানে হাদীস সহীহ কি সহীহ না সেদিকে বেশি দৃষ্টি দেয়া হত না। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সনদ সূত্রে যত হাদীস গ্রন্থকার মুহাদ্দিসের নিকট পৌঁছেছে, সহীহ কি সহীহ নয় সেদিকে বেশি দৃষ্টি না দিয়ে সনদ উল্লেখপূর্বক তা বর্ণনা করা হয়েছে 'মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক' শিরোনামের অধীনে। এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন দোষমুক্ত না হলেও এতে যে কল্যাণ আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের ইন্তেকালের হিজরী সনসহ নিম্নে উল্লেখ করা হল- মুসনাদ উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা (মৃ. ২১৩ হিঃ), মুসনাদুল হুমায়দী (মৃঃ ২১৯ হিঃ), মুসনাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (মৃঃ ২৩৮ হিঃ), মুসনাদ উসমান ইবনে আবু শায়বাহ (মৃঃ ২৩৯ হিঃ), মুসনাদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (জন্ম ১৬৪ হিঃ, মৃঃ ২৪১ হিঃ), আল মুসনাদুল কাবীর কুরতবী (মৃ: ২৭৬ হিঃ), মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী (মৃঃ ২০৪ হিঃ)।

২. আসমা-উর-রিজাল এবং হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনা বিজ্ঞান প্রণয়ন

তৃতীয় হিজরী শতকে মুহাদ্দিসগণ জলে-স্থলে ব্যাপক ভ্রমণ করে মুসলিম জাহানের প্রতি কেন্দ্রে তন্নতন্ন করে হাদীস খুঁজে বেড়াতে থাকেন। অন্যদিকে মুসলিম জাহানে নানাবিধ ফেতনার উদ্ভব হয় (বর্ণনা পরে আসছে)। ঐ ফেতনাসমূহের সাথে জড়িত প্রায় সকলেই নিজে কথা রচনা করে রাসূল (স.) এর হাদীস বলে বর্ণনা করতে শুরু করে। প্রতিটি বর্ণনার সাথে মনগড়া বর্ণনাসূত্র (সনদ) এমনভাবে জুড়ে দেয়া হয় যাতে মানুষ তাকে রাসূল (স.) এর কথা বলে বিশ্বাস করতে সনদের দিক দিয়ে কোনো সন্দেহে পতিত না হয়। এ কারণে প্রতিটি হাদীস, সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করে কোনটি রাসূল (স.) এর বাণী এবং কোনটি নয়, তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অতীব

গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতেই আসমা-উর-রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত) এবং হাদীস পর্যালোচনা বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে। এভাবে হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও ছাঁটাইয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ধারণকারী এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান, হাদীস শাস্ত্রে যৌক্তিক কারণেই স্থান লাভ করে।
(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন গ্রন্থের ৩১৬-৩৪২ পৃষ্ঠার আলোচনার ছায়া অবলম্বনে)

হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচারের এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে বনু আব্বাসীয়দের বাদশাহ্ আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (২৩২ হিঃ) হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। অপরদিকে সংগ্রহ, বাছাই-ছাঁটাই ও সংকলনের পর সহীহ হাদীসের সমন্বয়ে উন্নত ধরনের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজও তৃতীয় হিজরী শতকে বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা, ব্যাপকতা ও গভীরতা সহকারে সুসম্পন্ন হয়। এ বিরাট ও দুরূহ কাজের জন্যে যে প্রতিভা ও দক্ষতা অপরিহার্য ছিল তাতে ভূষিত হয়েই আবির্ভূত হন-

১. ইমাম বুখারী (রহ). (১৯৪-২৫৬ হিঃ)
২. ইমাম মুসলিম (রহ.) (২০৪-২৬১ হিঃ)
৩. ইমাম নাসায়ী (রহ.) (২১৫-৩০৩ হিঃ)
৪. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) (২০২-২৭৫ হিঃ)
৫. ইমাম তিরমিযী (রহ.) (২০৯-২৭৯ হিঃ)
৬. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) (২০৯-২৭৩ হিঃ)

এই ছয়জন মহৎ ব্যক্তি যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন সেগুলোই হচ্ছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না যেখানে সহীহুল বুখারী পাওয়া যাবে না। হাদীসের এ গ্রন্থসমূহ সংকলিত হওয়ার পর হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ধারা পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ মুখস্থ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচারের ধারা পরিবর্তন হয়ে পুস্তক বা গ্রন্থ আকারে সংরক্ষণ এবং পুস্তক পঠন-পাঠনের মাধ্যমে প্রচারের ধারা শুরু হয়ে যায় এবং তা দ্রুতগতিতে প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করে।

(আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা- ৩৭০-৪১৮)

৭. হিজরী ৫ম শতক থেকে বর্তমান কাল (হিজরী ১৪৩৬ বা ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত হাদীস সংরক্ষণ, সংকলন ও প্রচার ব্যবস্থা:

এ সুদীর্ঘ সময়ে যে কাজ হয়েছে তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে-

১. হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের ভাষ্যগ্রন্থ, টীকা ও অন্যান্য ভাষায় তরজমা গ্রন্থ রচিত হওয়া।

২. হাদীসের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর অসংখ্য গ্রন্থ এবং এ সব গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ রচিত হওয়া।

৩. বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তৃতীয় যুগের গ্রন্থাবলী থেকে নিজেদের আগ্রহ বা প্রয়োজনে হাদীস চয়ন করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ ধরনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে-

ক. মিশকাতুল মাসাবীহ: সংকলক ওয়ালীউদ্দীন খতীব তাবরীযী। নির্বাচিত সংকলনগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সকল হাদীসসহ আরও দশটি মৌলিক গ্রন্থের হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

খ. রিয়াদুস-সালেহীন: সংকলক ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শরফুদ্দিন নববী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ)। এখানে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. মুনতাকাল আখবার বিল আহকাম

ঘ. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব

ঙ. মাসাবীহুস সুন্নাহ ইত্যাদি

(আল-হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা- ৪৪১ ও ৪৪২)

৪. কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পর কম্পিউটার ডিস্কের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে হাদীস প্রচারের কাজ শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৮. ভবিষ্যতে হাদীস সংগ্রহ

বিজ্ঞান যেভাবে প্রসার লাভ করছে তাতে মনে হয় সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন রাসূল (স.) এর সকল কথা মহাশূন্য থেকে উদ্ধার করে সরাসরি তাঁর কণ্ঠে শুনা যাবে এবং তাঁর সকল কাজের ছবি মহাশূন্য থেকে উদ্ধার করে সরাসরি দেখা যাবে। সেদিন মানব সভ্যতা আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কথা, কাজ ও সমর্থন সরাসরি তাঁর নিকট থেকে জানতে পারবে। আর তখন একটি হাদীস প্রকৃতভাবে রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন কিনা এ ব্যাপারে আর কোনোই সন্দেহ থাকবে না।

হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞা ও তার পর্যালোচনা

প্রচলিত গ্রন্থসমূহে 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞা: প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞা লেখা আছে এভাবে- 'রাসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলে'।

সংজ্ঞাটির পর্যালোচনা

দৃষ্টিকোণ-১

❑ কুরআনের দৃষ্টিকোণ

কুরআনে 'হাদীস' শব্দটি আছে কিন্তু 'সহীহ হাদীস' কথাটি নেই। কিন্তু প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে উভয় কথা আছে। এ তথ্য প্রমাণ করে যে- কুরআনে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা নেই। কিন্তু হাদীসগ্রন্থে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা আছে।

কুরআন হলো- আল্লাহর কথা, বক্তব্য, বাণীর শাব্দিকরূপ/রিওয়ায়েত বিল লফজ। অর্থাৎ অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লেখিত তথা নির্ভুল রূপ। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী কারো কথা বা কাজ 'হাদীস' হতে হলে সেটি শাব্দিকরূপ (রেওয়ায়েত বিল লফজ) হতে হবে। তাই, কুরআনে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা নেই।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ সংজ্ঞাটির দৃষ্টিকোণ

হাদীস শব্দের প্রচলিত সংজ্ঞাটি (রাসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন হলো হাদীস) যদি সঠিক হয় তবে-

১. 'সহীহ হাদীস' বলতে বুঝাবে, রাসূল (স.)-এর সত্য কথা, কাজ ও অনুমোদন
২. 'দুর্বল হাদীস' বলতে বুঝাবে, রাসূল (স.)-এর দুর্বল কথা, কাজ ও অনুমোদন
৩. 'জাল হাদীস' বলতে বুঝাবে রাসূল (স.)-এর জাল (মিথ্যা) কথা, কাজ ও অনুমোদন।

রাসূল (স.) মিথ্যা বা দুর্বল কথা বলতে পারেন না। তাই এ সংজ্ঞা সঠিক হতে পারে না। আর তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়- হাদীসগ্রন্থে থাকা 'হাদীস' শব্দটির সংজ্ঞায় দুর্বলতা আছে।

হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা

হাদীসশাস্ত্রে 'হাদীস' শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে। আর এর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো- রাসূল (স.)-এর পরের চার স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী), ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের, রাসূল (স.)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাব বর্ণনা (রেওয়ায়েত বিল মা'নি তথা নিজ বুঝের, স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে বলা বর্ণনা) বা শাব্দিক বর্ণনা (রেওয়ায়েত বিল লফজ)। তবে বাস্তব কারণে শাব্দিক বর্ণনার সংখ্যা খুবই কম।

প্রশ্ন হতে পারে হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের এ সংজ্ঞা কোথায় পাওয়া গেল বা কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এ প্রশ্নের উত্তর হলো- প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস'-এর উল্লেখিত সংজ্ঞাটি একসাথে কোথাও লেখা নেই। সংজ্ঞার এ তথ্যগুলো সকল হাদীস গ্রন্থে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা শুধু তথ্যগুলোকে মালা গেঁথেছি। তাই চলুন এখন দেখা যাক প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে এ কথাগুলো কিভাবে উল্লেখিত আছে-

ক. চার স্তরের বর্ণনাকারী থাকার প্রমাণ

১. কিতাবুল আসার (ইমাম আবু হানিফা রহ. রচিত)
- এক স্তর (শুধু সাহাবী) বিশিষ্ট- কয়েকটি
- দুই স্তর (সাহাবী ও তাবেয়ী) বিশিষ্ট- অনেকগুলো

২. মুয়াত্তা (ইমাম মালিক রহ. রচিত)
- এক স্তর বিশিষ্ট- নেই
- দুই স্তর বিশিষ্ট- অধিকাংশ

৩. সহীহুল বুখারী
- তিন স্তর (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী) বিশিষ্ট- ২২ টি
- চার স্তর (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে-তাবে-তাবেয়ী) বিশিষ্ট- বাকি সব

৪. মুসনাদে আহমদ (ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. রচিত)
- তিন স্তর বিশিষ্ট- ১৫ টি
- চার স্তর বিশিষ্ট- বাকি সব

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ
- তিন স্তর বিশিষ্ট- ৫টি
- বাকি সব- চার স্তর বিশিষ্ট

৭. সুনানে আবু দাউদ
- তিন স্তর বিশিষ্ট- ১টি
- বাকি সব - চার স্তর বিশিষ্ট

৮. জামে আত তিরমিযি
- তিন স্তর বিশিষ্ট- ১টি
- বাকি সব- চার স্তর বিশিষ্ট

৯. সহীহ মুসলিম
- চার স্তর বিশিষ্ট- সবগুলো

১০. সুনানে নাসায়ী

- চার স্তর বিশিষ্ট- সবগুলো

খ. ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের বর্ণনা করা কথাকে হাদীস হিসেবে গ্রহণ করার প্রমাণ

ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমানদার, দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিক হতে পারে। হাদীসের ভাণ্ডার থেকে 'সহীহ হাদীস' পৃথক করার পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কথাকে যে 'হাদীস' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রমাণ হলো-

১. 'আসমা-উর-রেজাল' সংকলন করার সময়কাল

আসমা-উর-রিজাল হলো হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন সম্পর্কিত তথ্য ধারণকারী এক অপূর্ব শাস্ত্র। এটি প্রণয়ন করা সমাপ্ত হয় হিজরী ৩০০ (তিনশত) বছরের দিকে। এ অপূর্ব শাস্ত্রে প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস বর্ণনাকারীর জ্ঞান, তাকওয়া, আমল, সততা, দায়িত্ববোধ, স্মরণশক্তি, বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ, পরিচিতি ইত্যাদি ছোট-বড় অসংখ্য বিষয় যে নির্ভরযোগ্যতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা- ২৯)

আসমা-উর-রিজাল প্রণয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া এবং পরে তা প্রণয়ন করা থেকে বুঝা যায় এটি প্রণয়ন করা আরম্ভ করা থেকে শেষ করা পর্যন্ত (৩০০ হিজরী সাল) হাদীস বর্ণনাকারীদের তেমন যাচাই-বাছাই করা হয়নি বা যাচাই-বাছাই পদ্ধতিতে দুর্বলতা ছিল। অর্থাৎ ঐ সময় পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার (শক্তিশালী মু'মিন, দুর্বল মু'মিন ও মুনাফীক) ব্যক্তিদের বর্ণনা করা কথা 'হাদীস'-এর তালিকায় ঢুকে যাওয়া সম্ভব ছিল।

২. তাবেয়ী ইবনে শিরীনের বক্তব্য

বিখ্যাত তাবেয়ী ইবনে শিরীন (১১০ হিঃ) বলেন- (মুসলিমরা) পূর্বে হাদীসের বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন না। পরে যখন জাল হাদীসের ফিতনা দেখা দেয় তখন তাঁরা বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করেন। অতঃপর যাদের আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যেতো তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো এবং যাদের বিদয়াতপন্থী পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হতো না।

(সহীহ মুসলিম, আল মুকাদ্দামাহ, পৃষ্ঠা-১০)

৩. হাদীসকে সহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ, যঈফ, জাল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিদের দ্বারাই জাল ও যঈফ হাদীস বর্ণিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই, এখান থেকেও বুঝা যায়, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে 'সহীহ হাদীস' পৃথক করার পূর্ব পর্যন্ত ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের কথাকে 'হাদীস' হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

গ. রাসূল (স.) এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের ভাব বর্ণনাকে (রেওয়িত বিল মা'নি তথা নিজ বুঝের, স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে বলা বর্ণনা) হাদীস হিসেবে গৃহিত হওয়ার প্রমাণ

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে বহুল প্রচারিত একটি কথা হলো- রাসূল (স.)-এর সময়ের আরবদের স্মরণ শক্তি খুব প্রখর ছিল। তাই, তারা রাসূল (স.)-এর কথা একবার শোনার পর অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখতে পারতো। অর্থাৎ সকল বা প্রায় সকল সহীহ হাদীস শাব্দিক বর্ণনা/রেওয়ায়েত বিল লাফজ তথা নির্ভুল। তাই, বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❑ ফে'য়লী হাদীসের (রাসূল স.এর কাজ) দৃষ্টিকোণ

ভিডিও রেকর্ডিং ছাড়া একটি কাজ দেখে সেটি শতভাগ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই, সহজে বলা যায়- প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকা রাসূল (স.)-এর সকল ফে'য়লী হাদীস ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ কাওলী হাদীসের (রাসূল স. এর কথা বা অনুমোদন) দৃষ্টিকোণ

অডিও রেকর্ডিং ছাড়া কারো বলা কথা (খুব ছোট কথা ব্যতীত) একবার শোনার পর শাব্দিকভাবে তথা হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাড়ি, কমা ও সেমিকোলনসহ বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থের কাওলী হাদীসগুলো প্রকৃতভাবে লেখা হয়েছে রাসূল (স.)-এর বলা কথা ৫-৭ জন ব্যক্তির (রাবী) মুখ ঘুরে, প্রায় ২০০-৩০০ বছর পর । আর প্রত্যেক রাবী পূর্ববর্তী রাবীর মুখ থেকে একবার কথাটি শুনেছেন। তাই, সহজেই বলা যায়- প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে থাকা কাওলী হাদীসসমূহ প্রায় সব বা অধিকাংশ ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৩

❑ কুরআন, হাদীস ও কবিতা মুখস্ত রাখার দৃষ্টিকোণ

একবার শোনার পর শব্দে শব্দে বর্ণনা করা- কুরআনের আয়াতের ব্যাপারে কঠিন হলেও সম্ভব হতে পারে, কবিতার ব্যাপারে কুরআনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত

কঠিন, কারো কথা বা বক্তব্যের ব্যাপার অসম্ভব। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থের কাওলী হাদীসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণ তার পূর্বের বর্ণনাকারীর নিকট থেকে একবার শুনে বর্ণনা করেছেন। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজেই বলা যায়- প্রচলিত হাদীস গ্রন্থসমূহে থাকা কাওলী হাদীসসমূহ প্রায় সব বা অধিকাংশ শাব্দিক বর্ণনা নয়। ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ আমাদের গবেষণার ফলাফল

আমাদের গবেষণায়- কোনো সাহাবীর বলা একই বক্তব্য বিষয় (মতন) সম্বলিত হাদীসের একাধিক গ্রন্থে থাকা বর্ণনায় বা একটি গ্রন্থে একাধিক সাহাবীর একই বক্তব্য বিষয় সম্বলিত হাদীসের বর্ণনায় শব্দ অভিন্ন পাওয়া যায়নি। এ তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, প্রচলিত হাদীসের প্রায় সবগুলো বা অধিকাংশ ভাব বর্ণনা।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে যা ঘটতো

ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে সাহাবী বা অন্য স্তরের মানুষেরা রাসূল (স.)-এর কথা প্রচার করতেন না। ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির কথাগুলোর মহাকল্যাণ থেকে মানব সভ্যতা অবশ্যই মাহরুম হতো। তাই, এ তথ্যের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়- ভাব বর্ণনায় হাদীস বলার অনুমতি থাকার কথা।

♣♣ পৃষ্ঠা নং ২৪ এ উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ.

অনুবাদ: (হে নবী) তোমার জিহবাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের।

(কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিলের প্রথম দিকে রাসূল (স.) ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর নিকট থেকে আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে বারবার পড়তেন। রাসূল (স.)-এর এ প্রবণতার প্রেক্ষিতে এখানে তাঁকে জানানো

হয়েছে- কুরআনের আয়াত শুনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত না হতে। কারণ, তিনি যেন স্থায়ীভাবে ভুলে না যান তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহর।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ . إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ .

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তোমাকে (পুন:) পাঠ করাবো (Revision দেয়াবো), তাই তুমি ভুলে যাবে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।

(আ'লা/৮৭: ৬, ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে জিব্রাইল (আ.)-এর নিকট থেকে আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয়ে রাসূল (স.)-এর বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে- Revision দেয়ার ব্যবস্থা করে রাসূল (স.) যেন কুরআন স্থায়িভাবে ভুলে না জান তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। রাসূল (স.)-এর ভয় এবং সে ভয় লাঘবের জন্য আল্লাহর করা ওয়াদার আলোকে সহজে বলা যায়, আল্লাহ জানেন যে- তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী রাসূল (স.)সহ সকল মানুষের, কোনো কথা একবার শুনার পর ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে তার মাত্রার পার্থক্য হতে পারে। তাই, রাসূল (স.) যেন স্হায়ীভাবে কুরআনের কোনো অংশ ভুলে না যান সে জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেয়ার ওয়াদাটি করেছিলেন। পরে আসা হাদীসের মাধ্যমে জানা যাবে আল্লাহ তাঁর করা ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ করেছেন।

সম্মিলিত শিক্ষা: ছান্দিকতার কারণে কুরআন মুখস্থ করা ও রাখা সবচেয়ে সহজ। অন্যদিকে, কারো বলা কথা শোনার পর শব্দে শব্দে তথা হুবহু মনে রাখা ও বলা সবচেয়ে কঠিন। কুরআন থেকে জানা যায়- জিব্রাইল (আ.)-এর নিকট থেকে কুরআনের আয়াত শোনার পর ভুলে যাওয়ার ভয় রাসূল (স.)-এর ছিল এবং আল্লাহ তা'য়ালা Revision দেয়ার মাধ্যমে তাঁকে স্থায়ীভাবে ভুলে যেতে দেবেন না বলে আশ্বস্ত করেছেন। তাই, ৪ স্তরের ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির প্রত্যেকে পূর্বের স্তরের ব্যক্তির নিকট থেকে 'হাদীস' একবার শুনে শাব্দিকভাবে তথা হুবহু বর্ণনা করেছেন কথাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। আর তাই, সহজে বলা যায়- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা।

♣♣ পৃষ্ঠা নং ২৪ এ উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা।

আল হাদীস

হাদীস-১

তাবারানীর নিকট আবদুল্লাহ বিন সুলাইমান থেকে হাদীসে মারফুতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূল (স.) কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার থেকে হাদীস শ্রবণ করি অথচ যেমন শ্রবণ করি হুবহু তেমন বর্ণনা করতে পারি না। হরফের দিক দিয়ে কম বেশি হয়ে যায়। রাসূল (স.) বললেন, যদি তুমি হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম না কর এবং সঠিক অর্থ করতে সক্ষম হও তবে কোনো অসুবিধা নাই। অতঃপর এ বিষয়টি হযরত হাসান বসরীর (রহ.) নিকট আলোচনা করলে তিনি বললেন, যদি এই অনুমতি না থাকতো তাহলে আমি হাদীস বর্ণনা করতাম না।

(مقدمة بذل المجهود, আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা নং ২৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়-

১. হাদীসের ক্ষেত্রে ভাব বর্ণনার অনুমতি রাসূল (স.) নিজেই দিয়েছেন।
২. ভাব বর্ণনার অনুমতি না থাকলে রাসূল (স.)-এর হাদীস আমাদের নিকট পৌঁছাতো না।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহঃ) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার উপর মিথ্যারোপ করে- হাম্মাম (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন, ইচ্ছাকৃতভাবে; তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- *সহীহ মুসলিম,* আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিসাপুরী, كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ (যুহুদ ও দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণহীনতা অধ্যায়), بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْحَدِيثِ وَحُكْمِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (ধীর-স্থীরভাবে হাদীস বর্ণনা করা এবং ইলম লিপিবদ্ধ করার হুকুম পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩০০৪, পৃ. ৮৪৯।

ব্যাখ্যা: হাদীসটি মাক্কী জীবনের। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, মাদানী জীবনে রাসূল (স.) হাদীস লেখার অনুমাতি দিয়েছিলেন। তাই, হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়- মাক্কী জীবনে সকল হাদীস প্রচারিত হয় শোনার পর মুখে মুখে। সাহাবীগণের মধ্যে লিখতে পারতেন হাতের গননায় কয়েকজন মাত্র। আর তাই, হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়- মাক্কী ও মাদানী জীবনে অধিকাংশ হাদীস প্রচারিত হয় শোনার পর মুখে মুখে। শোনা কথা শব্দে শব্দে বলা অসম্ভব। তাই, হাদীসটির আলোকে বলা যায়- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (রিয়াওয়িত বিল মা'নি)।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ ' حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন
- ইমাম আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম,* (কায়রো: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রি.), كِتَابُ الْإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ,

بِمِلَّتِهِ (সকল ধর্মের মানুষের জন্য আমাদের নবীর রিসালাতের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়া ও তাঁর ধর্মের মাধ্যমে সকল ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৪০, পৃ. ৫২।

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে, যে হাদীস শুনবে বলা হয়েছে। পড়বে বলা হয়নি। তাই, হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়- অধিকাংশ হাদীস শোনার পর মুখে মুখে প্রচার করা হয়েছে। তাই, এ হাদীসটির আলোকে বলা যায়- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (রিয়াওয়িত বিল মা'নি)।

হাদীস-৪.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ نُسِّيتُهَا.

অনুবাদ: ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি ওয়াকী' থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন- আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূল (স.)-একজন লোককে একটি আয়াত পড়তে শুনলেন, তখন রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ লোকটির উপর রহম করুন। লোকটি আমাকে একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলো যা আমি ভুলে গিয়েছি।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (মুসনাদে আয়েশা সিদ্দিকা রা.), হাদীস নং ২৪৩৩৫, পৃ. ২৩২।

হাদীস-৪.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْفَجْرِ فَتَرَكَ آيَةً، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالَ أُبَيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ نُسِّيتَهَا؟ قَالَ: نُسِّيتُهَا.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* সাঈদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবজা (রা.) তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স.)-ফজরের সালাতে ভুলে এক আয়াত না পড়ে সামনে চলে গেলেন, সালাত শেষে রাসূল (স.) বললেন, এই! এখানে 'উবাই বিন কা'ব' উপস্থিত নেই? উবাই উত্তরে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! এমন এমন (তিনি তিলাওয়াত করলেন) আয়াতটি কী রহিত হয়ে গেছে? নাকি আপনি ভুলে গেছেন?। তখন রাসূল (স.) বললেন- না, বরং আমি ভুলে গেছি।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), مُسْنَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ (মুসনাদে আবদুর রহমান বিন খুজায়ী), হাদীস নং ১৫৩৬৫, পৃ. ৪৯২।

ব্যাখ্যা: হাদীস দু'টির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রাসূল (স.)-এর জীবনে কুরআনের আয়াত অস্থায়ীভাবে ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকা অধিকাংশ হাদীস হলো রাসূল (স.)-এর পরের ৪ স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে তাবেয়ী) ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির মুখ ঘুরে আসার পর লিপিবদ্ধ হওয়া কথা। হাদীস দু'টি অনুযায়ী তাই সহজে বলা যায়- ৪ স্তরের ৫-৭ জন আরব ব্যক্তির প্রত্যেকে পূর্বের স্তরের ব্যক্তির নিকট থেকে 'হাদীস' একবার শুনে বর্ণনা করতে কোনো ভুল করেননি বা শব্দে শব্দে বর্ণনা করেছেন (রিয়াওয়েত বিল লাফজ) প্রচারণাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। তাই, এ হাদীস দু'টির আলোকেও বলা যায়- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (রিয়াওয়েত বিল মা'নি)।

হাদীস-৫.১

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দানের ব্যাপারে রাসূল (স.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা দারাজদিল। আর তাঁর এই দারাজদিল অবস্থা রমযানে সর্বপেক্ষা বেড়ে যেত। রমযানের প্রত্যেক রাতেই জিব্রাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতেন এবং রাসূল (স.) তাঁকে কুরআন আবৃত্তি করে শুনাতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিব্রাইল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৭৩)

হাদীস-৫.২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيه .

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (স.)-এর নিকট প্রত্যেক বছর (রমযানে) কুরআন একবার আবৃত্তি করা হত। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর আবৃত্তি করা হল দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এতেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু এন্তেকালের বছর এতেকাফ করেন ২০ দিন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৯৯৮)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'টি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় রাসূল (স.) যেন কুরআনের আয়াত স্থায়ীভাবে ভুলে না যান সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা (রিভিশন দেয়া) নিয়েছিলেন। পৃথিবীর সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ আরব মানুষটির, একবার কুরআন শোনার পর ভুলে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকলে সাহাবী বা অন্য স্তরের ৫-৭ জন ভালো মুসলিম, হাদীস একবার শোনার পর শব্দে শব্দে বর্ণনা করেছেন কথাটি অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য। তাই, এ হাদীস দু'টির আলোকেও বলা যায়- খুব ছোট হাদীস ব্যতীত সকল হাদীস ভাব বর্ণনা (রিয়াওয়িত বিল মা'নি)।

হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতা ও তার পর্যালোচনা

হাদীসশাস্ত্রের 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতাগুলো হলো-

ক. ঈমানের 'দাবিদার' ব্যক্তির বর্ণনাকে গ্রহণ করা

এটি সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কারণ, ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি নিষ্ঠাবান মুসলিম, দুর্বল মু'মিন বা মুনাফিক হতে পারে। মুনাফিক ব্যক্তি কর্তৃক বানানো কথাকে রাসূল (স.) এর হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়াটিই স্বাভাবিক।

খ. ভাব বর্ণনা গ্রহণ করা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে প্রায় সব/অধিকাংশ হাদীস হলো ভাব বর্ণনা। অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী তার পূর্বের স্তরের বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শুনার পর যা বুঝেছেন সেটি তার নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একজন সৎ

মানুষেরও কারো কথা শুনতে, বুঝতে ও বর্ণনা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। এটিও একটি দুর্বলতা। কিন্তু এর অনুমতি দেয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, খুব ছোট হাদীস ব্যতীত হুবহু (অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ) বর্ণনা করা অসম্ভব।

গ. চার স্তরের ব্যক্তিদেরকে বর্ণনাকারী হিসেবে গ্রহণ করা

একটি কথা যতো অধিক মানুষের মুখ ঘুরে ভাব বর্ণনা হবে, অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ততো অধিক হবে। অধিকাংশ হাদীস চার স্তরে থাকা ৫-৭ জন বর্ণনাকারীর মুখ ঘুরে আসার পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি হাদীসশাস্ত্রে থাকা 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার আর একটি দুর্বলতা। কিন্তু রাসূল (স.) ইন্তেকালের প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ বছর পর হাদীস লিপিবদ্ধ করা প্রকৃতভাবে আরম্ভ করা হয়েছে। তখন এটির অনুমতি দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

হাদীসের বিভিন্ন অংশ

হাদীসশাস্ত্রে একটি হাদীসকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. সনদ (سند) তথা বর্ণনাসূত্র বা পরম্পরা

২. মতন (متن) তথা বক্তব্য বিষয়।

হাদীস জালকরণ

বিশেষ বিশ্বাসে বিশ্বাসী একটি জাতিকে কখনও শক্তি প্রয়োগ বা বহিরাক্রমণের মাধ্যমে শেষ করা যায় না। বিশেষ করে সে জাতি যদি নির্ভুল, যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও কল্যাণকর বিশ্বাসের উপর বিশ্বাসী হয়। ইসলাম বিরোধী শক্তি এ চিরসত্য বিষয়টি খুব ভালো করে জানতো এবং এখনও জানে। তাই বহিরাক্রমণের মাধ্যমে সময়ে সময়ে ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করে থাকলেও ইসলামের শত্রুদের প্রধান চেষ্টা ছিল জ্ঞানের মধ্যে ভুল বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে ইসলামকে ভিতর থেকে শেষ করে দেয়া। এই প্রচেষ্টার প্রথমে তারা কুরআন মাখলুক না গায়ের মাখলুক এ ধরনের নানা কথা প্রচার করে কুরআন তথা কুরআনের বক্তব্য নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এটি করে সফল হওয়া যাবে না বুঝতে পেরে তারা হাদীসের দিকে দৃষ্টি দেয়। এ লক্ষ্যে প্রথমে নানা কৌশলে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা বিভিন্ন উপদলের মত বা চাওয়া-পাওয়ার সহায়ক হয় এমন কথা বা তথ্য বানিয়ে তার সাথে প্রকৃত হাদীসের বর্ণনাসূত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ মনগড়া বর্ণনাসূত্র (সনদ) জুড়ে দিয়ে সেটিকে রাসূল (স.) এর হাদীস বলে মানুষের সামনে পেশ করে। নিজস্ব মত বা চাওয়া-পাওয়ার সহায়ক দেখে সেগুলো বিভিন্ন উপদলের মুসলমানরা সহজে গ্রহণ করে

নেয়। এভাবে অসংখ্য জাল হাদীস মুসলমান সমাজে চালু হয়ে যায়। হাদীস শাস্ত্রের হাদীস শব্দের সংজ্ঞায় দুর্বলতা থাকার কারণে তাদের এ কাজ অনেকটা সহজ হয়। চলুন এখন জানা যাক বিভিন্ন সময়ে কারা এটি করেছে এবং কেন তা করেছে।

রাসূল (স.) এর জীবিত অবস্থায় হাদীস জাল করা সম্ভব ছিল না। কারণ বর্ণিত কোনো হাদীসের নির্ভুলতা বা সত্যতা সরাসরি রাসূল (স.) এর কাছ থেকে যাচাই করে নেয়া অত্যন্ত সহজ ছিল।

রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের পর ধর্ম ত্যাগী (মুরতাদ) ও মুনাফিক কিছু ব্যক্তি জাল হাদীস বানানোর চেষ্টা করে কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা সময়মত কঠোর পদক্ষেপ নেয়ায় তারা সফল হয়নি। তাছাড়া তখন বর্ণিত হাদীস সত্য বা নির্ভুল কিনা তা যাচাইয়ের জন্যে হাজার হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

হিজরী ৩৬ সনে সংঘটিত সিফফীন যুদ্ধের সন্ধিসূত্র নিয়ে হযরত আলী (রা.) এর সমর্থকদের মধ্যে মারাত্মক মতভেদ দেখা দেয়। একদল ঐ সন্ধিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত তারা খাওয়ারিজ নামে এক স্বতন্ত্র ধর্মীয় দলের রূপ লাভ করে। সর্বপ্রথম হাদীস জালকরণের কাজ এই খাওয়ারিজদের দ্বারা সূচিত হয়।

খাওয়ারিজরা নিজেদের মতের সমর্থন যোগানোর জন্যে হাদীস জাল করে তা প্রচার করা আরম্ভ করে। আল্লামা ইবনুল জাওজী তাঁর কিতাবুল মাওদুয়াত গ্রন্থে ইবনে লাহইয়ার (যিনি পূর্বে খাওয়ারিজ ছিলেন) নিম্নের উক্তিটি উল্লেখ করেছেন-

إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيْثَ دِيْنٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُوْا دِيْنَكُمْ فَانَا كُنَّا إِذَا هَوَيْنَا اَمْرً اَضَيَّرْنَهُ حَدِيْثً

অনুবাদ: এই হাদীসসমূহ ইসলাম (ইসলামের ভিত্তি)। দ্বীনের এই ভিত্তিগত জিনিস তোমরা যার নিকট থেকে গ্রহণ কর তার প্রতি (যাচাইয়ের) দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। কারণ, আমরা (খাওয়ারিজরা) যখন কোনো কিছু চালু করতে ইচ্ছা করতাম তখন তাকে হাদীস বলে প্রচার করে দিতাম।

খাওয়ারিজদের পর শিয়া সম্প্রদায় হাদীস জালকরণ কাজে লিপ্ত হয়। হযরত আলী (রা.) এর উচ্চ প্রশংসা এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য খলীফার মর্যাদা লাঘবের জন্যে তারা বিপুল হাদীস জাল করে। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রধান হাদীস রচনাকারী মুখতার ইবনে আবু উবাইদ। তিনি প্রকাশ্যভাবে হাদীস জাল করতেন। কুফায় আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি জনৈক মুহাদ্দিসকে বলেছিলেন-

ضَعْ لِيْ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ (ص) اِنَّهُ كَائِنٌ بَعْدُهُ خَلِيْفَةٌ.

অনুবাদ: আমার জন্যে রাসূল (স.) এর নামে এমন কিছু হাদীস রচনা করে দাও যা থেকে বুঝা যায় তিনি (মুকতার) তৎকালীন খলিফার পর খলীফা হবেন।

(আল হাদীসু ওয়াল মুহাদ্দীসুন, পৃষ্ঠা-২৯ থেকে ৮৬)

মুসলমানদের মধ্যে যারা দুর্বল ঈমানদার তারা হযরত আলীর মর্যাদা লাঘব এবং হযরত আবু বকর ও ওমরের মর্যাদা বাড়ানোর জন্যেও হাদীস রচনা করে প্রচার করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে হাদীস জালকরণ আরো ব্যাপকতর হয়। লোকেরা কিসসা-কাহিনী, মিথ্যা ও অমূলক কিংবদন্তী প্রকৃত হাদীসের ন্যায় বর্ণনা সূত্রসহকারে প্রচার করতে শুরু করে। এ সময়কার হাদীস জালকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থবাদী, অতি ধর্মপরায়ণ, কিসসা-কাহিনী বর্ণনাকারী ও গোপন ধর্মদ্রোহী লোকেরা প্রধান ছিল।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা-২৮৬)

জাল হাদীস তৈরীর কারণ

উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় দেখা যায় মূলত তিনটি কারণে হাদীস জাল করা হয়-

ক. রাজনৈতিক কারণ

এখানে উদ্দেশ্য ছিল-

- নিজেদের মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপন
- নিজেদের মতাদর্শের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকত্ব প্রমাণ করা
- জনগণের নিকট নিজেদের মতাদর্শ গ্রহণযোগ্য করা।

(ইবনুল জাওজী, কিতাবুল মাওদুয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮)

(হযরত আলী (রা.)কে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক কারণে সর্বপ্রথম জাল হাদীস রচিত হয়)

খ. ধর্মীয় কারণ

এখানে উদ্দেশ্য ছিল-

- জনগণকে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো
- মানুষকে ইবাদাত-বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী করানো
- পরকালের পুরস্কারকে অধিক লোভনীয় এবং শাস্তিকে অধিক ভীতিময় করানো।

(ইবনুল জাওজী, কিতাবুল মাওদুয়াত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০)

গ. ব্যক্তিগত কারণ

এ বিভাগে উদ্দেশ্য ছিল-

- ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভকে সহজসাধ্য করা
- ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ দোষের নয় প্রমাণ করা।

(আশশাওকানী, আল ফাওয়ায়িদুল মাজমুআতু ফীল আহাদিসীল মাওদুয়াহ, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা- ৪১৫)

জাল হাদীস প্রচারের পদ্ধতি

পদ্ধতি-১

নিজ স্বার্থ বা চিন্তা-ভাবনার অনুকুলে একটি তথ্য বানিয়ে তাতে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দেয়া। তারপর সেটিকে রাসূল (স.) এর হাদীস হিসেবে মুখে মুখে প্রচার করে দেয়া। এটি জাল হাদীস প্রচারের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত পদ্ধতি।

পদ্ধতি-২

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হিঃ) বলেন- হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পান্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

(ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯/সুয়ুতী,তাদরীবুর রাবী,১ম খন্ড,পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪; হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

ব্যাখ্যা: এ প্রক্রিয়ায় জাল হাদীস প্রচার করার পদ্ধতি আরম্ভ হয় হাদীস গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করা শুরু হওয়ার পর। এ পদ্ধতি অখ্যাত নয় বিখ্যাত মুহাদ্দিসদের হাদীসগ্রন্থে বেশী প্রয়োগ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, তারা জানতো অখ্যাত মুহাদ্দিসদের গ্রন্থে লেখা হাদীস বেশি মানুষ পড়বে না।

জাল হাদীস তৈরীর পরিমাণ

ক. ইমাম বুখারী ৬,০০,০০০ (ছয় লাখ) হাদীস সামনে নিয়ে বুখারী শরীফ প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করেন। এর মধ্য থেকে তিনি ৯,০৮২টি হাদীস সহীহ বুখারীতে সংকলন করেন। এর মধ্যে থাকা মুয়াল্লাক (معلق), মুতাবিয়াত (متابعات) ও মাওকুফাত (الموقوفات) তথা দুর্বল হাদীস বাদ দিলে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩৯৭টি (সাত হাজার তিনশত সাতানব্বইটি)। এই ৭৩৯৭টি সহীহ হাদীসের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে মোট সহীহ হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ২৬০২ (দুই হাজার ছয়শত দুই)টি। ভিন্ন মতে ২৭৬১টি।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন পৃষ্ঠা-৩৭৯; মুকাদ্দামাতু ফাতহুল বারী, শরহুল বুখারী, তাহজীবুল আসমাউ লিন নববী)

খ. ইমাম মুসলিম ৩,০০,০০০ (তিন লাখ) হাদীস সামনে নিয়ে তাঁর গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন। এর মধ্য থেকে তিনি মাত্র ১২,০০০ (বার হাজার) হাদীস মুসলিম শরীফে উল্লেখ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন। আর ঐ ১২,০০০ মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,০০০ (চার হাজার)।

(তাদরীবুর রাওয়ায়ী, পৃষ্ঠা-৩০)

গ. ইমাম আবু দাউদ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস যাচাই-বাছাই করে মাত্র ৪,০০০ (চার হাজার) হাদীস তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা-৪১১)

♣♣ এ তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায় কি বিপুল পরিমাণ জাল হাদীস সমাজে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের কারণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসশাস্ত্রের 'হাদীস' শব্দের সংজ্ঞার দুর্বলতার কারণে স্বার্থান্বেষী মহল এবং দুর্বল ও অদূরদর্শী ঈমানদাররা বিপুল সংখ্যক হাদীস বানিয়ে সমাজে ছড়িয়ে দেয়। এ অসংখ্য জাল হাদীসের মধ্য থেকে গ্রহণযোগ্য হাদীস পৃথক করা বা গ্রহণযোগ্য হাদীস কোনগুলো তা বুঝার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণেই হাদীসশাস্ত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

হাদীসের পরিভাষার বিবর্তনের ক্রমধারা

প্রথম দিকে হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রধানত বর্ণনা সূত্রের ধারা-বাহিকতাকেই গুরুত্ব দেয়া হত। অর্থাৎ একটি হাদীস বিশুদ্ধ কিনা তা বুঝার জন্যে বর্ণনাকারীদের ধারা বা পরম্পরা, রাসূল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা, কোন স্তরে রাবী (বর্ণনাকারী) অনুপস্থিত আছে কিনা এগুলোকেই প্রধানত গুরুত্ব দেয়া হত। ঐ সময় হাদীস যাচাইয়ের প্রধান পদ্ধতি যে এটিই ছিল তা সহজে জানা যায় ইমাম মুসলিম কর্তৃক সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখিত তাবেয়ী ইবনে শিরীন (১১০ হি:) নিম্নের উক্তি থেকে-

لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ.

অনুবাদ: মুসলমানগণ পূর্বে হাদীসের সনদ (বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন না। পরে যখন জাল হাদীসের ফিতনা (বিপর্যয়) দেখা দেয় তখন তারা বর্ণনাকারীদের নাম (গুণাগুণ) জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করেন। অতঃপর যাদের আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত এবং যাদের বিদয়াতপন্থী পাওয়া যেত তাদের হাদীস গ্রহণ করা হত না।

(সহীহ মুসলীম, আল মুকাদ্দামাহ, পৃষ্ঠা- ১০)

প্রথম দিকে যে পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করা হতো তা নিম্নরূপ-

১. **মারফু:** যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা রাসূল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং রাসূল (স.) ও হাদীস সংকলনকারী পর্যন্ত সকল স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সুরক্ষিত আছে।

২. **মাওকুফ:** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। এর অপর নাম আছার।

৩. **মাকতু:** যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র (সনদ) শুধু তাবেয়ী পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৪. **মুত্তাসিল:** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছে।

৫. **মুনকাতি:** যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। কোনো স্তরে রাবির নাম বাদ পড়েছে।

৬. **মুরসাল:** যে হাদীসে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে।

হিজরী তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ দেখতে পেলেন হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকার কারণে লোকেরা বিভিন্ন কারণে নিজেদের বানানো কথার সাথে প্রকৃত হাদীসের ন্যায় বর্ণনাকারীদের নাম জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে রাসূল (স.) এর হাদীস বলে ব্যাপকভাবে চালিয়ে দিচ্ছে। তাই তারা হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের দিকে আরো গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। এটি করতে গিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তারা প্রথমে করেছেন তা হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। এ শাস্ত্রের নাম দেয়া হয়েছে 'আসমা-উর-রিজাল'। এ অপূর্ব শাস্ত্রে প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ) হাদীস বর্ণনাকারীর জ্ঞান, তাকওয়া, আমল, সততা, দায়িত্ববোধ, স্মরণশক্তি, বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ, পরিচিতি ইত্যাদি ছোট-বড় অসংখ্য বিষয় যে ধরনের নির্ভরযোগ্যতা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, জীবন চরিতের ব্যাপারে এর দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।

(ইলমুর রিজালিল হাদীস, পৃষ্ঠা-২৯)

এ সময় মুহাদ্দিসগণ যোগ্যতা বা গুণাগুণের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেন-

প্রথম শ্রেণী

এ শ্রেণীর বর্ণনাকারী হচ্ছে তারা যারা অত্যন্ত মুত্তাকী, শরীয়তের নিষ্ঠাবান অনুসারী, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন, ইসলামের বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, সুবিবেচক, মুখস্থ করা বিষয়সমূহের পূর্ণ হেফাজতকারী এবং বিদায়াত বিরোধী।

দ্বিতীয় শ্রেণী

এ শ্রেণীর বর্ণনাকারীগণ অন্য সব দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের সমান, কিন্তু স্মরণশক্তির দিক দিয়ে কম। এ শ্রেণীতে দু'ধরনের লোক পাওয়া যায়। এক ধরনের লোক তারা যারা কেবল স্মরণশক্তির উপর নির্ভর না করে হাদীস লিখে রাখতেন। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা হাদীস লিখে রাখতেন না। তাই মূল হাদীসের কোনো কোনো শব্দ ভুলে গেলে বর্ণনা করার সময় তার সম-অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করতেন।

তৃতীয় শ্রেণী

এ শ্রেণীর বর্ণনাকারী তারা যারা শরীয়াতের অনুসরণকারী মুত্তাকী তবে জ্ঞান-বুদ্ধি, বোধশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের সমান নয়। যা তাদের মনে আছে তাই তাদের মূলধন। যে অংশ ভুলে গেছেন সেদিকে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

চতুর্থ শ্রেণী

এ শ্রেণীর বর্ণনাকারীগণ ইসলামের অনুসরণকারী ও শরীয়াত পালনকারী বটে কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনা ও দূরদৃষ্টির দিক থেকে পশ্চাৎপদ। মানুষকে নসিহত করা, পরকালীন পুরস্কারের আশ্বাস ও শাস্তির ভয় দেখানোর জন্যে হাদীস রচনা করাকে তারা জায়েয মনে করতেন। আবার এ শ্রেণীতে দলাদলি ও বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরাও শামিল রয়েছে। এ শ্রেণীর আবার চারটি পর্যায় রয়েছে। যেমন-

১ম পর্যায়: এ পর্যায়ে হচ্ছে তারা যারা বৈষয়িক মান-সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে হাদীসসমূহে রদবদল বা নতুন হাদীস রচনা করতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

২য় পর্যায়: এ পর্যায়ে হচ্ছেন তারা যারা নিজেদের খুঁটিনাটি মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কিত মতের সমর্থনে, উস্তাদগণের নিজস্বভাবে প্রয়োগকৃত শব্দ হাদীসের মধ্যে শামিল করে দিতেন।

৩য় পর্যায়: এ পর্যায়ে অবস্থান তাদের যারা বুদ্ধি-বিবেচনা কম হওয়ার কারণে উস্তাদগণের উল্লেখিত ব্যাখ্যা দানকারী শব্দসমূহকে মূল হাদীসেরই অংশ মনে করতেন।

৪র্থ পর্যায়: এ পর্যায়ে অবস্থান হচ্ছে সেই সব ইসলামের দুশমনদের যারা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে দলাদলি, বিভেদ-বিচ্ছেদ, কোন্দল সৃষ্টি এবং তাতে ইন্ধন যোগাতে হাদীস রচনা করে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র ভয় পেত না।

(তারিখুল হাদীস আব্দুস সামাদ সাওমুল আজহারী)

পরবর্তীতে মুহাদ্দিসগণ রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) চরিত্রের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তাদের বর্ণিত হাদীসকে বিভিন্ন নাম দেন। এ নামকরণের উদ্দেশ্য ছিল পাঠক বা শ্রোতাকে নামের মাধ্যমেই হাদীসটির বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা ও বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ধারণা দেয়া। ঐ বিষয়গুলো খেয়াল রেখে হিজরী তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিসগণ সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য থেকে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্যে সনদের ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে চূড়ান্ত করেন এবং বাছাইকৃত হাদীসকে মোটাদাগে নিম্নোক্তভাবে নামকরণ করেন-

১. **সহীহ:** সকল স্তরে বর্ণনাকারী রয়েছে এবং সকল বর্ণনাকারী নির্ধারিত সব ধরনের গুণে গুণান্বিত

২. **হাসান:** বর্ণনাকারীদের সহীহ হাদীসের মত অন্য সকল গুণ আছে কিন্তু কোন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল।

৩. **যঈফ**: বর্ণনাকারীদের মধ্যে নির্ধারিত সব রকমের গুণ কম থাকা।

সহীহ হাদীস

'সহীহ হাদীস' কথাটি শুনেননি এমন মুসলিম বর্তমান যুগে পাওয়া দুষ্কর হবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো প্রায় সব সাধারণ মুসলিম এবং অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'সহীহ হাদীস' বলতে যা বুঝেন তা প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে। আর এর ফলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার যে ক্ষতি হচ্ছে তা কথায় বর্ণনা করা যাবে না। তাই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সাধারণ মুসলিম এবং অধিকাংশ মাদ্রাসা শিক্ষিত ব্যক্তি 'সহীহ হাদীস' বলতে 'নির্ভুল হাদীস' তথা মতন বা বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হাদীসকে বুঝেন। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীসকে বুঝানো হয়নি। আর প্রচলিত সহীহ হাদীস সম্পর্কে অসতর্ক ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রধান একটি কারণ হলো 'সহীহ' শব্দটি। সহীহ (صحيح) একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, বিশুদ্ধ, সত্য ইত্যাদি। তাই, বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম 'সহীহ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী 'সহীহ হাদীস' বলতে সেই হাদীস বোঝেন যার বক্তব্য বিষয় নির্ভুল বা সত্য। কিন্তু প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে এটি বুঝানো হয়নি।

সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার কুফল

সহীহ হাদীস সম্পর্কে প্রচলিত অসতর্ক ধারণার প্রধান দু'টি কুফল হলো-

১. অধিকাংশ মুসলিম সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে তথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়

২. কারো মনে সন্দেহ হলেও মুখে তা প্রকাশ করতে সাহস পায় না।

প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা

প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মণীষী ও গ্রন্থ থেকে যা জানা যায়-

তথ্য-১

اَلصَّحِيْحُ فَهُوَ مَاإِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالعُدُوْلِ الضَّابِطِيْنَ مِنْ غَيْرِ شُذُوْذٍ وَلاَ عِلَّةٍ

অনুবাদ: যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র মুত্তাসিল (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রাসূল স. পর্যন্ত পৌঁছেছে), বর্ণনাকারীগণ ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(ইমাম নববীর বক্তব্য। এটি উল্লিখিত আছে যঈফ ও মউজু হাদীসের সংকলন, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, সংকলন ও অনুবাদে মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, আর আই এস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ২০০০ খ্রিঃ, পৃঃ ১১)

তথ্য-২

أَمَّا اَلْحَدِيثُ اَلصَّحِيحُ فَهُوَ اَلْحَدِيثُ اَلْمُسْنَدُ اَلَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ عَنْ اَلْعَدْلِ اَلضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ, وَلَا يَكُونَ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا

অনুবাদ: সহীহ হাদীস হলো সে হাদীস যার বর্ণনাসূত্র শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে (কোনো স্তরে ছেদ ছাড়া রাসূল সা: পর্যন্ত পৌঁছেছে), রাবীগণ পূর্ণ 'আদালাত' ও 'যবত' গুণ সম্পন্ন এবং 'শায' ও 'মুয়াল্লাল' হবে না।

(ইবনে কাসীরের বক্তব্য। উল্লিখিত আছে, 'ইখতিসারু উলুমুল হাদীস' এর ভূমিকায়)

তথ্য-৩

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ন্যায়বান ও স্মৃতিশক্তিতে প্রখর ব্যক্তিদের মাধ্যমে রাসূল (স.) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং যা শায বা ইল্লাত (মুয়াল্লাল) নয় তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়।

(বুখারী ও মুসলিম শরীফের ভূমিকা)

তথ্য-৪

মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই সমস্ত বিভক্তি হয়েছে হাদীসের বর্ণনাসূত্র ও বর্ণনাকারীদের ভিত্তিতে।

(রিয়াদুস সালেহীন; প্রথম প্রকাশ, ১ম খন্ড, প্রসঙ্গ কথা, পৃষ্ঠা-৫)

তথ্য-৫

যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মওজুদ আছে তাকে সহীহ হাদীস বলে-

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন
৪. যা শায নয়
৫. যা মুয়াল্লাল নয়

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

শায হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) যদি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত হয় তাহলে সেটিকে শায বলা হয়। এটিই পরিভাষার দিক দিয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা।

(শরহু নুখবাতিল ফিকার, পৃষ্ঠা-১২৪)

তথ্য-২

ঐ হাদীসকে শায বলে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত, কিন্তু সে হাদীস তার চেয়েও অধিকতর বিশ্বস্ত রাবীর বর্ণনার বিপরীত।

(এন্তেখাবে হাদীস, ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

♦♦ অনেকে মনে করেন শায হাদীস বাছাই করতে যেয়ে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাই, সহীহ হাদীসের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতাও যাচাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় তা নয়। শায হাদীস নির্ণয়ে বিপরীত বক্তব্যধারী দু'টি হাদীসকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ পর্যালোচনায় অধিক শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বল বর্ণনাকারীর বলা হাদীসটিকে 'শায' নাম দিয়ে বাদ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শেষ বিচারে এ বাছাইও করা হয়েছে বর্ণনাকারীর ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।

মুয়াল্লাল হাদীসের সংজ্ঞা

তথ্য-১

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি রহিয়াছে যাহাকে কোনো বড় হাদীস বিশেষজ্ঞ ব্যতীত ধরতে পারে না সে হাদীসকে হাদীসে মুয়াল্লাল বলে। আর এরূপ ত্রুটিকে ইল্লত বলে'।

(মেশকাত শরীফ। ১ম জিলদ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, আগষ্ট ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-জ)

তথ্য-২

'যে হাদীসের বর্ণনাসূত্রে এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা কেবল হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই পরখ করতে পারেন তাকে মুয়াল্লাল বলে'।

(এন্তেখাবে হাদীস; ১০ম প্রকাশ, পৃষ্ঠা-৩৩)

অর্থাৎ হাদীসকে মুয়াল্লাল বলা হয়েছে বর্ণনাসূত্রের ত্রুটির ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের ত্রুটির ভিত্তিতে নয়।

♦♦ উপর্যুক্ত তথ্যগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, বর্ণনাসূত্রে নিম্নের ৫টি গুণ থাকা হাদীসকে 'সহীহ হাদীস' বলে-

১. মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনাসূত্র)
২. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য
৩. বর্ণনাকারীগণ স্বচ্ছ স্মরণশক্তি সম্পন্ন হওয়া
৪. শায না হওয়া
৫. মুয়াল্লাল নয়

তাই, নিশ্চিত করে বলা যায়, 'সহীহ হাদীস'-এর সংজ্ঞা হলো বর্ণনাসূত্র (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস। অন্যকথায় বলা যায়, হাদীসকে সহীহ বলা হয়েছে বর্ণনা সূত্রের (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস না বুঝানোর দলিলসমূহ

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে যে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হাদীস বুঝানো হয়নি তার দলিলসমূহের শিরোনাম-

১. সংজ্ঞা
২. শ্রেণীবিভাগ
৩. রহিত হওয়া
৪. কিছু রাবী সকল বিশেষজ্ঞের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়া

৫. রাবীদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়কারীগণ মানুষ হওয়া
৬. কুরআন বিরুদ্ধ সহীহ হাদীসের উপস্থিতি।

দলিলসমূহের পর্যালোচনা-

১. সংজ্ঞা

হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী 'সহীহ হাদীস' বলতে বুঝায় বর্ণনাসূত্র নির্ভুল হওয়া হাদীস।

২. শ্রেণীবিভাগ

প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীসকে বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ভিত্তিতে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক. মুতাওয়াতির সহীহ: যে সহীহ হাদীসের প্রতি স্তরে অনেক বর্ণনাকারী আছে
খ. মশহুর সহীহ: যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী তিনজন
গ. আজীজ সহীহ: যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী দু'জন
ঘ. গরীব সহীহ: যে সহীহ হাদীসের কোনো স্তরে বর্ণনাকারী একজন।

সহীহ হাদীসকে এভাবে বিভক্ত করার প্রধান কারণ হলো-বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেয়া। যেমন-

ক. মুতাওয়াতির সহীহ

বক্তব্য বিষয় ১০০% নির্ভুল। কারণ বিভিন্ন স্তরের অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের একটি বিষয় বুঝতে ও উপস্থাপন করতে একই ধরনের ভুল হওয়া অসম্ভব।

খ. মশহুর সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

গ. আজীজ সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

ঘ. গরীব সহীহ

বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আজীজ সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

৩. রহিত হওয়া

প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রের বিধান হলো, বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে শক্তিশালী একটি সহীহ হাদীস বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল একটি সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়কে রহিত করতে পারে। একটি নির্ভুল বক্তব্য অন্য একটি নির্ভুল বক্তব্যকে রহিত করতে পারে না। তবে একটি নির্ভুল বক্তব্য একটি ভুল বক্তব্যকে রহিত করতে পারে। তাই, রহিত করার বিধান থেকে বুঝা যায়, সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না।

৪. কিছু রাবীকে (হাদীস বর্ণনাকারী) সকল হাদীস বিশেষজ্ঞের গ্রহণ না করা

প্রায় ৬২৫ জন বর্ণনাকারী এমন আছেন যাদের ইমাম বুখারী যোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেননি অথবা উল্টোটি হয়েছে। এ তথ্য থেকে বুঝা যায়, কমপক্ষে ৬২৫টি সহীহ হাদীস আছে যার বক্তব্য বিষয় অগ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৫. বর্ণনাকারীগণকে বাছাইকারী ব্যক্তিগণ মানুষ হওয়া

যে ব্যক্তিগণ হাদীসের বর্ণনাকারীদের বাছাই করেছেন তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। ঐ বাছাই প্রক্রিয়ায় তাদের কোনোই ভুল হয়নি, এটি বিশ্বাস করলে শিরকের গুনাহ হবে।

৬. কিছু সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত হওয়া

প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে কিছু সহীহ হাদীস পাওয়া যায় যার বক্তব্য বিষয় কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত। চলুন প্রথমে তেমন কয়েকটি হাদীস দেখা যাক-

হাদীস-১

অনুবাদ: উবাদা বিন ছামেত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর দাস ও রাসূল, ঈসাও ছিলেন আল্লাহর দাস ও রাসূল, তাঁর বাঁদীর সন্তানও আল্লাহর কালেমা বিশেষ যা তিনি মরিয়মের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) রূহ এবং বেহেশত ও দোযখ সত্য, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত দান করবেন; তার আমল যা-ই থাকুক না কেন?

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে জানা যায়, যার ঈমান আছে সে পরকালে বেহেশতে যাবে তার আমলনামায় বড় (কবীরা) বা ছোট (ছগীরা) যে গুনাহই থাকুক না কেন।

এ বিষয়ে কুরআন

আল-কুরআনের বহু স্থানে স্পষ্টভাবে বলা আছে বেহেশত পেতে হলে ঈমান ও ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে। আর অন্য অনেক স্থানে পরিস্কারভাবে বলা আছে মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ মাফ করে না নিতে পারলে মু'মিন ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই এ হাদীসের বক্তব্য কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যু বরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কী?'** নামক পুস্তিকাটিতে।

হাদীস-২

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ، ثُمَّ اَتَيْتُه، وَ قَدْ سْتَيْقَظَ فَقَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلى ذَالِكَ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَاِنْ زَانى وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَاِنْ زَانى وَاِنْ سَرَق. قُلْتُ وَاِنْ زَانى وَاِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَ اِنْ زَانى وَاِنْ سَرَق عَلى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ ، وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ ، اِذَ حَدَّثَ بِهَاذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ .

অনুবাদ: আবুজর গিফারী (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে পৌঁছলাম। তখন তিনি সাদা কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন। অতঃপর আবার গিয়ে দেখি তিনি জেগেছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যে বান্দাহ এ কথা বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদি সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে। আমি পুনঃ বললাম, যদি সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে। আমি আবার বললাম, যদিও সে জেনা ও চুরি করে? তিনি বললেন, যদিও সে জেনা ও চুরি করে, আবুজরের নাক কাটা গেলেও (অর্থাৎ আবুজর পছন্দ না করলেও)। পরবর্তী রাবী বলেন, আবুজর যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন, বলতেন আবু জরের নাক কাটা গেলেও।

(আল-মাকতাবুশ শামেলাহ, বুখারী, হাদীস নং ৫৮২৭; সহীহ মুসলিম-১৮১, মেশকাত নং ২৪)

ব্যাখ্যা: হাদীসটিতে বলা হয়েছে একজন ঈমানদার ব্যক্তি জেনা করলেও বেহেশতে যাবে। তাওবার কথা হাদীসটিতে উল্লেখ নেই।

জেনার বিষয়ে কুরআন

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

অনুবাদ: আর জিনার (অবৈধ যৌন মিলন বা (Casual sex) ধারে-কাছেও যেও না। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও অকল্যাণকর (বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী) পথ।

(বনী-ইসরাইল/১৭ : ৩২)

♦♦ আয়াতটিতে জেনা করাতো দুরের কথা জেনার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। অথচ হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঈমানদার ব্যক্তি জেনা করলেও বেহেশতে যাবে।

হাদীস-৩

কিছু সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে ঈমানদার ব্যক্তি গুনাহের জন্য জাহান্নামে গেলেও রাসূল (স.) এর শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

এ বিষয়ে কুরআন

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ.

অনুবাদ: যার উপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে); তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে?

(যুমার/৩৯ : ১৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে প্রথমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী যে ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অতঃপর বলা হয়েছে, যাকে বিচার করে আল্লাহ তা'য়ালা জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রাসূল (স.)ও শাফায়াত বা অন্যকোনোভাবে বাঁচাতে পারবেন না।

♣♣ রাসূলুল্লাহ (স.) কুরআনের বিপরীত কথা বলতে পারেন না। এ তথ্যটি স্পষ্টভাবে জানা যায় সূরা হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। এ হাদীসগুলো সহীহ হাদীস। কিন্তু হাদীসগুলোর বক্তব্য কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত। এ ধরনের আরো কিছু সহীহ হাদীস প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে উপস্থিত আছে। এখান থেকেও বুঝা যায় প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না।

প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বাছাই পদ্ধতির দুর্বলতা এবং তার কুফল

সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য হতে সত্য বা নির্ভুল হাদীস আলাদা করার জন্য সনদের ভিত্তিতে বাছাই করা অবশ্যই দরকার ছিল। আমাদের মণীষীগণ এ কাজটি করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছেন। কারণ, এখন সনদ যাচাই করতে চাইলে কোনোভাবেই তা করা যেত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য থেকে সত্য (নির্ভুল) হাদীস বাছাই করার জন্যে সনদ তথা বর্ণনাধারার ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দু'টি মারত্মক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি দু'টি হলো-

১. অসংখ্য নির্ভুল হাদীস 'সহীহ হাদীস' এর তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে

সনদের ভিত্তিতে যাচাইয়ের পদ্ধতিতে শুধু ব্যক্তিকে দেখা হয়েছে, বক্তব্য বিষয়কে দেখা হয়নি। এর ফলে যা ঘটেছে তা হলো-

- ব্যক্তির কম বা বেশী দুর্বলতার কারণে তার বর্ণনা করা হাদীসকে যঈফ বা জাল বলে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ হাদীসটি হয়তো নির্ভুল ছিল। এভাবে হাদীস বাদ দেয়ার অনেক প্রমাণ হাদীস শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে।
- দু'খানা হাদীসের বক্তব্য পরস্পর বিপরীত হলে যে হাদীসটির বর্ণনাকারী অপেক্ষাকৃত দুর্বল সে হাদীসটিকে শায বলে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু খুব ছোট হাদীস ব্যাতীত উপস্থিত হাদীসগ্রন্থে থাকা হাদীস হলো রাসূল (স.)-এর কথার ভাব বর্ণনা। তাই হাদীস বর্ণনা করার সময় একজন শক্তিশালী বর্ণনাকারীর অনিচ্ছাকৃতভাবে একটুও ভুল হয়নি এটি যেমন নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না তেমনিভাবে একথাও বলা যায় না যে, একজন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা করা সকল হাদীস ভুল।

এ দু'টি কারণে রাসূল (স.)-এর অসংখ্য হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীসের সংখ্যার স্বল্পতাই এ কথার প্রমাণ বহন করে। রাসুল (স.) এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি জীবনের সকল বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রনায়ক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি, স্বামী, বাবা, জামাতা, শ্বশুর, নানা ইত্যাদি সবই ছিলেন। অন্যদিকে তার সকল কথা, কাজ ও সমর্থন, এমনকি তাঁর ঘুমানো এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পদ্ধতিটিও হাদীস। সহজেই বুঝা যায়, এ ধরনের একজন ব্যক্তি ২৩ বছরের জীবনে যতো কথা, কাজ ও সমর্থন করেছেন তার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে প্রচলিত সহীহ হাদীসের সংখ্যা মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) এর কাছাকাছি। এ তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্যে সনদের ভিত্তিতে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র ও চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রাসূল (স.) এর অসংখ্য হাদীস সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে।

(ইবনে হাজার আসকালানী, হাদয়ুস সারী, পৃষ্ঠা- ৭)

২. কিছু ভুল বা মিথ্যা হাদীস 'সহীহ হাদীস' এর তালিকায় ঢুকে পড়েছে

সনদের মাধ্যমে বাছাই করে যে সকল হাদীসকে বর্তমান সহীহ হাদীসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে শুধুমাত্র মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসকে প্রায় একশতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে সত্য বলা যায়। মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। মশহুর, আজিজ ও গরীব সহীহ হাদীসের সত্যতা শতভাগ নিশ্চিত নয়। অধিকাংশ 'সহীহ হাদীস' এ তিন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

যে সকল কারণে প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর তালিকায় কিছু ভুল হাদীস ঢুকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে

১. অনুধাবন ও বর্ণনা করার যোগ্যতার দুর্বলতা

অনুধাবন ও বর্ণনা করার যোগ্যতা সকল মানুষের সমান নয়। এটি একটি চিরসত্য কথা। প্রায় সব সহীহ হাদীসের মতন হচ্ছে রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের, চার স্তরের, ৫-৭ জন ব্যক্তির, নিজ বুঝের, স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা বক্তব্যের লিখিত রূপ। সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীদের বাছাই করার সময় ব্যক্তির গুণাগুণের ব্যাপারে যে কঠোরতা মুহাদ্দিসগণ আরোপ করেছেন তাতে ঐ ধরনের ব্যক্তি কর্তৃক হাদীসের মতনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল ঢুকিয়ে দেয়া হয়নি এটি মোটামুটি নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। তবে মানবীয় দুর্বলতার কারণে বর্ণনাকারীগণের কারো রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে ও বর্ণনা করতে কোনো ভুল হয়নি এটি অবশ্যই বলা যায় না। অন্যান্য মানুষ তো দূরের কথা সাহাবায়ে কিরামদেরও যে রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে ও বর্ণনা করতে মত পার্থক্য হয়েছিল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হল।

(তথ্যগুলো বিখ্যাত মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (রহ.) এর আল ইনসাফ ফি বয়ানী আস্‌বাবিল ইখতিলাফ গ্রন্থের জনাব মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম কর্তৃক অনুবাদকৃত মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় নামক গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে)

দৃষ্টান্ত-ক

হজ্জের সময় রাসূল (স.) এর আবতাহা উপত্যকায় অবতরণের ঘটনাটি আবু হুরায়রাহ (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর মতে ইবাদাতের তথা হজ্বের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়েশা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে রাসূল (স.) ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং তা হজ্বের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (পৃষ্ঠা- ১৮)

দৃষ্টান্ত-খ

মুসনাদে আহমাদে উল্লিখিত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়। বক্তব্যটির ব্যাপারে আয়েশা (রা.) এর মন্তব্য হচ্ছে- এটি ইবনে ওমরের ধারণাপ্রসূত কথা। রাসূল (স.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থান, কাল, পাত্র তিনি অনুধাবন করতে পারেননি বা আয়ত্ত করে রাখেননি। প্রকৃত ঘটনা ছিল রাসূল (স.) এক ইহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন তার আপনজনরা মাতম করছে। তখন তিনি বললেন, এরা এখানে মাতম করছে অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে। রাসূল (স.) এর এ

বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ ছিল- আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করছে কিন্তু ইহুদী হওয়ার কারণে মৃত ব্যক্তিটির কবরে আযাব হচ্ছে। (পৃষ্ঠা- ২০ ও ২১)

দৃষ্টান্ত-গ

রাসূল (স.) এর পাশ দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন- রাসূল (স.) এ হাদীসের (এ কাজের) ভাবার্থ বর্ণনার ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর বক্তব্য হচ্ছে-

- কেউ কেউ বলেছেন- লাশের সাথে ফেরেশতা থাকেন। ঐ ফেরেশতাকে সম্মান দেখানোর জন্যে রাসূল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন
- কেউ কেউ বলেছেন- মৃত্যু ভীতির জন্য রাসূল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন
- কেউ কেউ বলেছেন- লাশটি ছিল ইহুদীর। নিজ মাথার উপর দিয়ে ইহুদীর লাশ অতিক্রম করুক এটি চাননি বলে রাসূল (স.) দাঁড়িয়েছিলেন

(মুসনাদে আহমাদ হতে সংকলিত)

দৃষ্টান্ত-ঘ

জামাউল ফাওয়ায়িদে উল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এর বর্ণনা করা একটি হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে রাসূল (স.) একটি উমরা করেছেন রজব মাসে। ঐ হাদীসটি জানতে পেরে আয়েশা (রা.) বলেন, ইবনে ওমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন।

(জামাউল ফাওয়ায়িদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৪৫ ও ৩৪৬)

দৃষ্টান্ত-ঙ

রাসূল (স.) খায়বার যুদ্ধের সময় মুতআ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর আওতাস যুদ্ধের সময় আবার মুতআ বিয়ের অনুমতি দেন। এবারও যুদ্ধের পর সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন। রাসূল (স.) এর এই কর্মপদ্ধতির মর্মার্থ থেকে মুতআ বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর মতামত হচ্ছে-

- হযরত ইবনে আব্বাসের মত- প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মুতআ বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন শেষে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজন ও তার গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত। এ জন্যে অনুমতি স্থায়ী।
- অন্য সাহাবীদের মত- অনুমতিটি ছিল মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রহিত করে দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত-চ

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বর্ণিত সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ص) يَقُوْلُ تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি, আগুনে উত্তপ্ত জিনিস গ্রহণ করার পর (সালাত পড়ার পূর্বে) ওজু কর। এ হাদীস শুনে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তবে তো ওজু থাকা অবস্থায় গরম পানি ব্যবহার করলেও আবার ওজু করতে হবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: নাসায়ী, হাদিস নং ১৭১)

♣♣ এ ধরনের আরো দৃষ্টান্ত আছে যেখান থেকে সহজেই জানা যায়, রাসূল (স.) এর কথা, কাজ বা সমর্থন বুঝতে সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যেও কারো কারো অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছিল। সুতরাং অন্য স্তরের মানুষেরও তা হওয়া স্বাভাবিক। সিহাহ সিত্তায় যে সকল সহীহ হাদীস উল্লেখ আছে তার অধিকাংশ রাসূল (সা.) থেকে গ্রন্থকার মুহাদ্দিসের নিকট পৌঁছেছে বিভিন্ন স্তরের ৫-৭ (পাঁচ থেকে সাত) জন বর্ণনাকারীর মুখ ঘুরে। প্রায় সবাই তার পূর্ববর্তীর নিকট থেকে শোনা বক্তব্যটির নিজ বুঝকে, স্বীয় ভাষায় বর্ণনা করেছেন এবং তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের প্রায় ২০০-২৫০ বছর পরে। তাই মানবীয় দুর্বলতার কারণে প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের কিছু সহীহ হাদীসের বক্তব্য, রাসূল (স.) এর প্রকৃত বক্তব্যের ভুল উপস্থাপন হওয়া অসম্ভব নয়। বরং স্বাভাবিক।

২. বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মণীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা

বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা বা হাদীস গ্রহণের শর্তের বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়-

ক. যাদের নিকট থেকে ইমাম বুখারী হাদীস গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন বা ইমাম মুসলিম গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন এমন শায়খ বা হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা ৬২৫ (ছয়শত পঁচিশ)।

(মুকাদ্দামাতু নাওয়াভী, শরহে মুসলিম, পৃষ্ঠা-৩)

অর্থাৎ এমন অনেক হাদীস আছে যাকে ইমাম বুখারী সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম মুসলিমের নিকট তা সহীহ নয় অথবা ইমাম মুসলিম সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইমাম বুখারীর নিকট তা সহীহ নয়।

খ. বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থে যাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে এমন এক বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারীর হাদীস ইমাম নাসায়ী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃষ্ঠা-৪১)

গ. ইমাম নাসায়ী এমন অনেক বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ করেননি যাদের নিকট থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীস গ্রহণ করেছেন।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়, বর্তমান বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত সকল সহীহ হাদীসের মতন (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুল না হওয়াই স্বাভাবিক।

৩. গ্রন্থকারের অজান্তে তার রচিত হাদীস গ্রন্থে জাল হাদীস লিখে রাখা

আল্লামা যাইনুদ্দিন ইরাকী (৮০৬ হিঃ) বলেন- হাদীস জালিয়াতির একটি পদ্ধতি ছিল পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য, পাণ্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।

(ইরাকী,আত-তাকঈদ,পৃষ্ঠা-১২৮,১২৯/সুয়ুতী,তাদরীবুর রাবী,১ম খন্ড,পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪)

এ পদ্ধতির পর্যালোচনা: এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল সহজে জাল হাদীসের প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। তাই, সহজেই বলা যায়, এ পদ্ধতি অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, অখ্যাত মুহাদ্দিসগণের গ্রন্থে থাকা হাদীস তেমন প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আর তাই এ পদ্ধতিতে জাল হাদীস ঢুকানো হয়েছে প্রধানত বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের রচিত গ্রন্থে।

প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত ‘সহীহ হাদীস’পরিভাষাটির নাম পরিবর্তন

ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে ‘সহীহ হাদীস’ বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না। তাই ‘সহীহ হাদীস’ নামটি একটি ভুল নাম (Misnomer)। কারণ, আরবী ‘সহীহ’ শব্দটির অর্থ হলো সত্য, সঠিক বা নির্ভুল। তাই, নামটি শুনেই সাধারণ মুসলিম ও অনেক মাদ্রাসায় পড়া ব্যক্তি মনে করেন ‘সহীহ হাদীস’ অর্থ সত্য বা নির্ভুল হাদীস। আর তাই ‘সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কেউ কোনো কথা বললে তা তারা চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়। এর ফলে মুসলিমদের অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। তাই ‘সহীহ হাদীস’ নামটি পরিবর্তন করা বিশেষভাবে দরকার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিদ্যায় অতীতের অনেক ভুল নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ, ঐ ভুল নামগুলোর ফলে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি উদাহরণ- চিকিৎসা বিজ্ঞানে Pylorus বলা হয় পাকস্থলির নিচের অংশকে। আর Duodenum বলা হয় ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশকে। ছবি দেখুন-

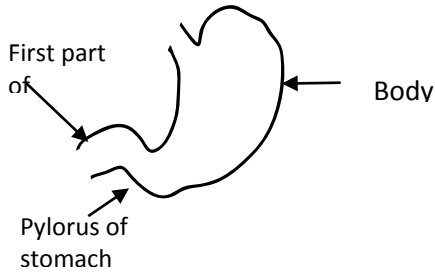

অনেক দিন ধরে আলসার রোগে ভুগলে Duodenum এর প্রথম অংশটি সরু হয়ে যায়। ফলে পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্তে খাবার যেতে বাধার সৃষ্টি হয়। এ রোগটির অতীতে নাম দেয়া হয়েছিল Pyloric stenosis. কিন্তু Pylorus হলো পাকস্থলির নিচের অংশ। তাই, Pyloric stenosis নামটি দ্বারা বুঝায় পাকস্থলির নিচের অংশ সরু বা চিকন হয়ে যাওয়া রোগ। তাই Pyloric stenosis একটি ভুল নাম। অনেক ছাত্র নামটি শুনে মনে করে Duodenal ulcer রোগে সরু হয় পাকস্থলির নিচের অংশ। এ ভুল নামটির কারণে অনেক ছাত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এজন্যে এ নামটি বর্তমানে পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে এ রোগটিকে বলা হয় Duodenal stenosis. এ নামটি শুনে যেকোনো ছাত্র Duodenal ulcer রোগে কোথায় চিকন বা সরু হয় তা সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

এ উদাহরণের আলোকে তাই সহজে বলা যায়, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' নামটি পাল্টানো বিজ্ঞান সম্মত কাজ হবে। এ কাজটি করতে পারলে মুসলিম জাতির বিরাট উপকার হবে। পরিবর্তিত নামটি হবে **'সনদ সহীহ হাদীস'**। যারা যথাযথ স্থানে আছেন তাদেরকে আমরা আহবান জানাচ্ছি এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য। অন্যথায় তাদেরকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে 'প্রকৃত সহীহ হাদীস'এর সংকলন রচনা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে-

- প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না। বর্ণনাধারা (সনদ) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায়।
- সনদের দুর্বলতার কারণে অনেক সত্য হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। ঐ হাদীসগুলোকে 'যঈফ' বা 'জাল' নাম দেয়া হয়েছে।

- কিছু ভুল হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকায় ঢুকে গিয়েছে। হাদীস ইসলামী জ্ঞানের দ্বিতীয় মূল উৎস। তাই রাসূল (স.)-এর একটি প্রকৃত হাদীস তালিকা থেকে বাদ যাওয়া যেমন মহাক্ষতির কারণ, তেমনই একটি ভুল কথা রাসূল (স.)-এর কথা হিসেবে তালিকায় ঢুকে পড়াও মহাক্ষতিকর। আর তাই বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে 'মতন সহীহ হাদীস'-এর তালিকা তৈরি করা মুসলিম জাতির জীবন মরণ প্রশ্ন। বিষয়টি আমরা পাঁচটি শিরোনামে আলোচনা করব-
  - ক. বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে প্রকৃত সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা
  - খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য
  - গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ
  - ঘ. প্রচলিত 'সহীহ' হাদীসের মতন যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি
  - ঙ. প্রচলিত 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি

ক. বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে প্রকৃত সহীহ হাদীসের নতুন তালিকা তৈরি করতে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা

Common sense

আমরা জেনেছি যে-

- প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝানো হয়নি
- সনদের দুর্বলতার করণে অনেক সত্য হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে
- নানা উপায়ে কিছু ভুল হাদীস প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকায় ঢুকে গিয়েছে।

তাই Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায় বর্তমান 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করে 'মতন সহীহ হাদীসের' সংকলন রচনা ইসলাম সম্মত হবে বললে কম বলা হবে। এটি মুসলিম জাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের নিকট ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করো না।

(আন-নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা: আয়াত তিনটিসহ সূরা নূরের ১১-২০ নং আয়াতের শানে নুযুল হলো বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আয়েশা (রা.)-এর উপর অপবাদ দেয়ার ঘটনা (ইফকের ঘটনা)। ঘটনাটি সম্পর্কে বুখারী শরীফে থাকা বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা' নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-১২)।

প্রচারণাটি প্রথম শুরু করে মুনাফিক সর্দার আবুদুল্লাহ বিন উবাই। তারপর সাহাবীগণের মুখের মাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সাহাবীগণ হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী মু'মিন। তাই আয়াত তিনটির শিক্ষা হলো- মুনাফিক, দুর্বল মু'মিন, শক্তিশালী মু'মিন এমনকি সাহাবীগণের বলা কোনো কথা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত না হওয়ার আগে সত্য বলে গ্রহণ ও প্রচার করা যাবে না।

তথ্য-২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, তা না হলে

অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে, অতঃপর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা অনুতপ্ত হবে।

(হুজুরাত/৪৯ : ০৬)

ব্যাখ্যা: বনী মুস্তালিক নামক গোত্র মুসলমান হলে রাসূল (স.) সাহাবী অলীদ ইবনে উকবাকে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে পাঠান। তিনি ঐ এলাকায় পৌঁছে কোনো কারণে ভয় পান এবং গোত্রের লোকদের সাথে কথা না বলে ফিরে যান। মদিনায় ফিরে তিনি রাসূল (স.) এর নিকট অভিযোগ করেন যে, লোকেরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। রাসূল (স.) এ কথা জানতে পেরে খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং ঐ গোত্রকে দমন করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন বা সেনাবাহিনী পাঠান। এ সময় ঐ গোত্রের সরদার হারিছ ইবনে জিরার একটি প্রতিনিধি নিয়ে এসে আল্লাহর কসম খেয়ে রাসূল (স.)কে জানান আমরা অলীদকে দেখি নাই। আর যাকাত দিতে অস্বীকার করা বা হত্যা করতে চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এ তথ্য জানার পর রাসূল (স.) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

(সিরাত ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা-২৩৭, ইবনে কাছীর, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯)

আল কুরআনে ফাসিক শব্দটি দুর্বল মু'মিন, গুনাহগার মু'মিন, কাফির ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো- কাফির, যালিম, গুনাহগার মু'মিন এমনকি সাহাবীও যদি কোনো কথা বলে তবে তা বিনা যাচাইয়ে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া নিষেধ।

আল হাদীস

হাদীস-১

أخرج الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا

قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن:] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! **অচিরেই ফিতনা (মিথ্যা হাদীস/তথ্য) ছড়িয়ে পড়বে।** আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, **আল্লাহর কিতাব,** যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমরা তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- ইমাম তিরমিযী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ।
- হাদীসটির মতন বা বক্তব্য বিষয় আল কুরআনের বক্তব্যের সম্পূরক এবং অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক। তাই হাদীসটির মতন সহীহ।
- ইমাম আর ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১২ খ্রি.), أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

ব্যাখ্যা: হাদীসটির বোল্ড করা অংশসমূহ থেকে পরিস্কারভাবে যে দু'টি কথা জানা যায় তা হলো-

১. মুসলিম সমাজে মিথ্যা হাদীস বা ইসলামের নামে বানানো কথা ছড়িয়ে পড়বে
২. ঐ সকল মিথ্যা হাদীস বা বানানো কথা থেকে বাঁচার উপায় হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন। অর্থাৎ কুরআন দ্বারা যাচাই করে ঐ সকল মিথ্যা হাদীস বাদ দিতে হবে।

তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো- হাদীস যার নিকট থেকে শোনা হোক না কেন তার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ'صَحِيْحِهِ ' حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত

হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, *সহীহ মুসলিম,* (কায়রো: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রি.), كِتَابُ الْإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ (সকল ধর্মের মানুষের জন্য আমাদের নবীর রিসালাতের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব হওয়া ও তাঁর ধর্মের মাধ্যমে সকল ধর্ম রহিত হয়ে যাওয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৪০, পৃ. ৫২।

ব্যাখ্যা: রাসূল (স.) সম্পর্কে শোনার অর্থ হলো- রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আগমন, কথা, কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি তথা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস শোনা। আর রাসূল (স.) কে প্রেরণ করা হয়েছে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআন ব্যাখ্যা করে মানুষকে শেখানোর জন্য। অন্যদিকে ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই হাদীসটির মূল বক্তব্য হলো- যে রাসূল (স.)-এর হাদীস শুনবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন এবং সে জ্ঞানকে প্রকাশ্য বা গোপনে বিশ্বাস করে ঈমান না এনে মারা যাবে তাকে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে।

হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের ২য় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর রাসূল (স.) যাদের সামনে কথাটি বলেছিলেন তাঁরা ছিলেন আরবী ভাষাভাষী ও রাসূলের (স.)-এর সাহাবী। তাহলে রাসূল (স.) কেনো এ কথাটি বলেছেন তা সকল যুগ বিশেষ করে বর্তমান যুগের মুসলিমদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। যে সকল প্রধান কারণে রাসূল (স.) এ কথা বলেছেন তার একটি হলো- জাল/মিথ্য হাদীস ধরতে না পারা।

তাই, এ হাদীসটিরও শিক্ষা হলো হাদীস যার নিকট থেকেই শোনা হোক না কেন তার বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে নিতে হবে।

খ. হাদীসের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে মনীষীদের বক্তব্য

হাদীসের নির্ভুলতা বা সত্যতা যাচাইয়ের উপস্থিত দু'টি পদ্ধতি হচ্ছে-
ক. রেওয়ায়েত তথা বর্ণনা সূত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ভুলতা যাচাই
খ. দিরায়াত তথা বক্তব্য বিষয় (মতন) পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ভুলতা যাচাই।

হাদীস যাচাইয়ের এ উভয় পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহ.) তাঁর হাদীস সংকলনের ইতিহাস নামের গুরুত্বপূর্ণ বইটির সপ্তম প্রকাশের ৪৫৩ ও ৪৫৪ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা হুবহু তার ভাষায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

“পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা হইতে দিরায়ত প্রক্রিয়ার যে কয়টি মূলনীতি প্রকাশিত হয়, তাহা এখানে একত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে-

১. হাদীস কুরআনের স্পষ্ট দলীলের বিপরীত হইবে না
২. হাদীস মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাতের বিপরীত হইবে না
৩. হাদীস সাহাবায়ে কিরামের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ইজমার বিপরীত হইবে না
৪. হাদীস সুস্পষ্ট বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত হইবে না
৫. হাদীস শরীয়াতের চির সমর্থিত ও সর্বসম্মত নীতির বিপরীত হইবে না
৬. কোনো হাদীস বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে গৃহীত হাদীসের বিপরীত হইবে না
৭. হাদীসের ভাষা আরবী ভাষার রীতি-নীতির বিপরীত হবে না। কেননা নবী করীম (স.) কোনো কথাই আরবী রীতি-নীতির বিপরীত ভাষায় বলেননি
৮. হাদীস এমন কোনো অর্থ প্রকাশ করবে না, যা অত্যন্ত হাস্যকর, নবীর মর্যাদা বিনষ্টকারী।

উসূলে হাদীস-এর গ্রন্থসমূহে এই পর্যায়ে আরো অনেক মূলনীতির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০০)

হাদীস যাচাই করা এবং সহীহ কি গায়ের সহীহ পরখ করার জন্য উপরে বর্ণিত দু’টি পন্থা রেওয়ায়েত ও দিরায়াত প্রয়োগ করার ব্যাপারে হাদীস-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক শ্রেণীর লোক কেবলমাত্র রেওয়ায়েত-প্রক্রিয়া বা সনদ যাচাইয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁদের দৃষ্টিতে সনদ ঠিক থাকলে এবং উহার ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে রক্ষিত হলেই হাদীস নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। আর অন্যদের মতে সনদ ঠিক হওয়ার তুলনায় মূল হাদীসটি যুক্তিসঙ্গত হওয়া তথা দিরায়াত যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হওয়াই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই দিক দিয়ে কোনো হাদীস সঠিকরূপে উত্তীর্ণ না হইলে তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এমনকি সনদ ঠিক হইলেও এবং সনদ বিচারে তাহা গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হলেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত মুহাক্কিক আলিমদের দৃষ্টিতে এককভাবে এই দু’টি পন্থাই ভারসাম্যহীন। উহার একটি একান্তভাবে সনদ নির্ভর। সনদ ছাড়া সেখানে আর কিছুই বিচার্য নয়। আর সনদ ঠিক ও নির্ভরযোগ্য হলেই সে হাদীস একান্তই গ্রহণীয়। দ্বিতীয়টি নিরংকুশভাবে বুদ্ধিভিত্তিক। সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দৃষ্টিতে মূল হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হইলে উহার সনদ বিচারের কোনো প্রয়োজনই মনে করা হয় না। অথচ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র সনদ কোনো কথাকে সত্য ও সঠিক প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হইতে পারে না, যেমন যথেষ্ট নয় কেবলমাত্র বুদ্ধি ও যুক্তি-বিচার! এই কারণে এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন ও ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য।”

গ. মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক প্রমাণিত হওয়া হাদীসের নামকরণ

সনদ 'সহীহ' ও 'যঈফ' হাদীসের তালিকা মুসলিম উম্মাহর নিকট উপস্থিত আছে। তাই, মতন (বক্তব্য বিষয়) যথাযথভাবে যাচাই করার পর যে হাদীসগুলোর মতন নির্ভুল বা ভুল বলে প্রমাণিত সেগুলোর নিম্নোক্ত নাম দেয়া যেতে পারে-

১. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস
২. সনদ দুর্বল মতন সহীহ হাদীস
৩. সনদ সহীহ মতন দুর্বল হাদীস
৪. সনদ ও মতন দুর্বল হাদীস

ঘ. প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর মতন (বক্তব্য বিষয়) যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা বা পদ্ধতি

ইসলাম নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের একটি সাধারণ নীতিমালা দিয়েছে। যে কোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য ঐ নীতিমালা হবে মূল নীতিমালা। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্র/মূলনীতি'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। প্রবাহচিত্রটি হলো-

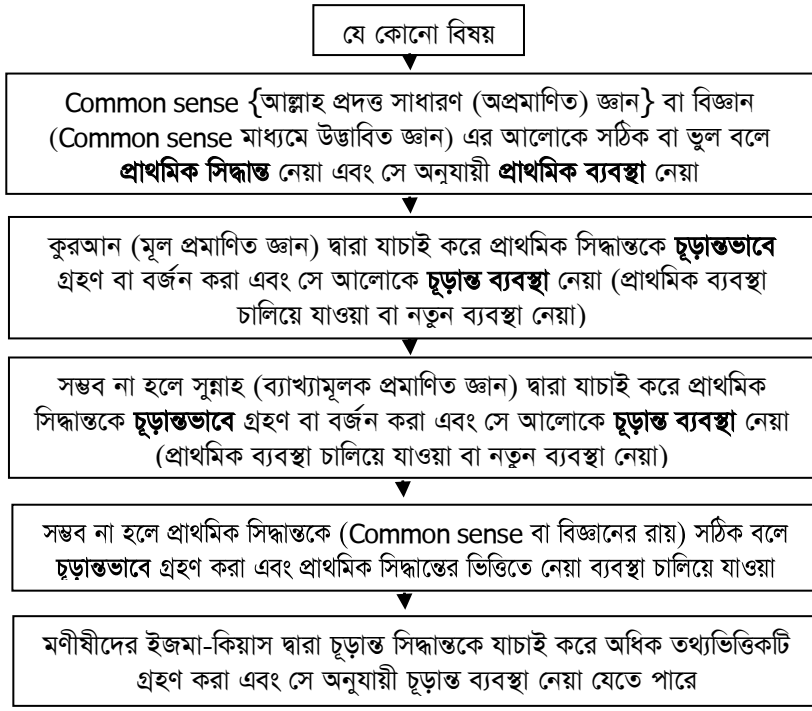

প্রচলিত 'সহীহ হাদীস'-এর মতন যাচাইয়ের ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/মূলনীতি প্রণয়ণ করতে হবে ইসলাম প্রদত্ত ঐ প্রবাহচিত্র/মূলনীতির আলোকে। আর নীতিমালাটিতে হাদীসের সনদ ও মতন **উভয়টিকে** যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রবাহচিত্র/মূলনীতিটি হবে নিম্নরূপ-

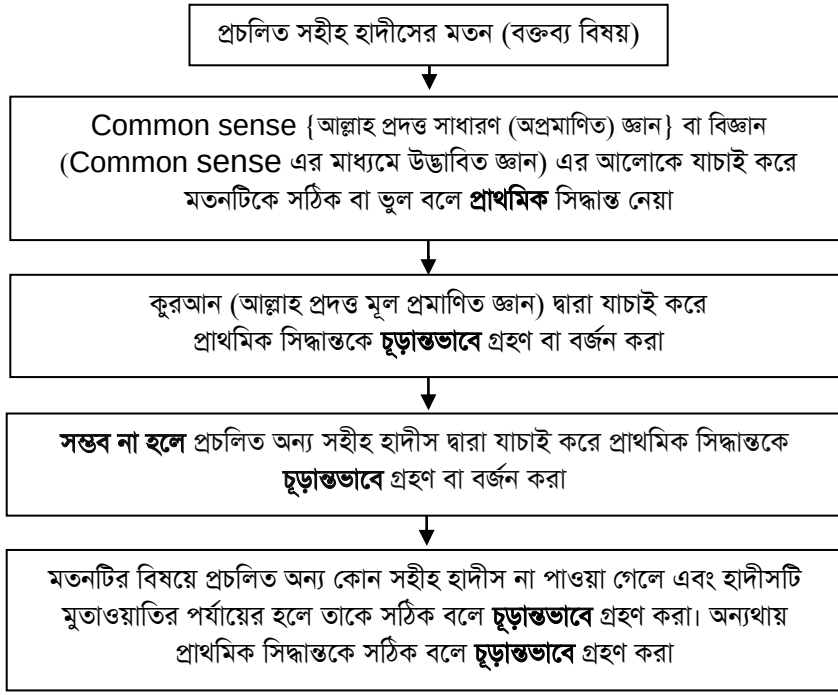

ঙ. প্রচলিত 'যঈফ' হাদীসের মতন যাচাই করার ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহচিত্র/মূলনীতি

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, বর্তমান হাদীস শাস্ত্রে সনদের মাধ্যমে যাচাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রাসুল (স.) এর অসংখ্য হাদীস বর্তমান সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। মানব সভ্যতার জন্যে সুখবর হলো ঐ হাদীসগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়নি। এখন আমাদের মতনের ভিত্তিতে যাচাই করে যঈফ বলে বাদ দেয়া হাদীসের মধ্য হতে রাসূল (স.) এর সঠিক কথাগুলো বের করে এনে 'মতন সহীহ' হাদীসের তালিকার সাথে যোগ করে দিতে হবে।

যে নীতিমালা বা ফর্মুলার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে তা হলো-

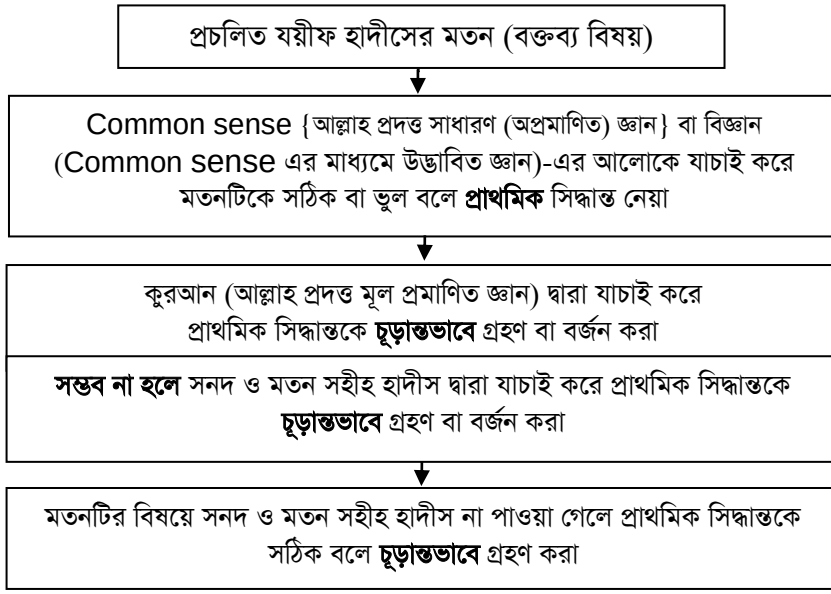

শেষ কথা

পুস্তিকার আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেছে যে-

- প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে 'সহীহ হাদীস' একটি ভুল নাম (Misnomer)। কারণ, প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নয়, বর্ণনা ধারা (সনদ) সহীহ হওয়া হাদীসকে বুঝানো হয়েছে। এ তথ্যটি মান সম্মত অনেক আলিম জানেন। কিন্তু এটি প্রায় একশত ভাগ সাধারণ মুসলিমের দৃষ্টির বাইরে।
- সত্য-মিথ্যা হাদীসের মধ্য হতে সত্য হাদীস বাছাই করার জন্যে সনদের মাধ্যমে বাছাই করার পদ্ধতিকে একমাত্র এবং চূড়ান্ত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার কারণে রাসূল (স.)-এর অসংখ্য সত্য হাদীস, প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে।
- বিভিন্ন কারণে রাসূল (স.)-এর হাদীস নয় এমন কিছু কথা প্রচলিত সহীহ হাদীসের তালিকার মধ্যে ঢুকে গেছে।

তাই, ইসলামী জ্ঞানের ২য় মূল উৎস সুন্নাহ (হাদীস) থেকে প্রকৃত কল্যাণ পেতে হলে মুসলিম জাতিকে প্রচলিত 'সহীহ হাদীস' এবং 'যঈফ হাদীস' বলে বাদ দেয়া হাদীস থেকে পুস্তিকায় উল্লিখিত প্রবাহচিত্র/মূলনীতির আলোকে বাছাই করে মতন (বক্তব্য বিষয়) সহীহ হাদীসের তালিকা বের করতে হবে। এটি জাতির

জীবন-মরণ প্রশ্ন। তাই অনতিবিলম্বে এ কাজ আরম্ভ করতে হবে। আর 'মতন সহীহ' হাদীসের চূড়ান্ত তালিকা বের হওয়ার আগ পর্যন্ত সাধারণ মুসলিমদের মিথ্যা হাদীসের চরম ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যে প্রচলিত সহীহ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় সত্য হওয়া হাদীস বুঝায় না, বর্ণনাধারা ত্রুটিমুক্ত হাদীস বুঝায়, এ তথ্যটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

আল হামদুলিল্লাহ, কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষকগণ গত কয়েক বছর ধরে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের একটি তালিকা চূড়ান্ত করেছেন। গবেষণা কর্মটিকে ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালের মধ্যে **'সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন ১ম খণ্ড'** শিরোনামে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। মুসলিম উম্মাহ ও মানব সভ্যতার জন্য এ গ্রন্থ বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে।

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ধরিয়ে দেয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় পাঠকদের নিকট অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের সকলকে, মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু থাকা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরুদ্ধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর কথাগুলো উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতিকে জানানোর কাজটি করার সৎ সাহস দান করুন। রাব্বুল আলামিনের নিকট এ দোয়া করে শেষ করছি! আমিন! ছুম্মা আমিন!

আমিন!

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে **Common sense** এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসঙ্গত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও **Common sense** ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা

৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৫টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৬. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- ❑ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা,
  ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬

- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
  মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী
  মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
  মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম,
  মো: ০১৮২২১৬৮৯৫১, ০১৮৪০৭৪৭৩০৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী,
  মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা
  মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম
  কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী
  মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে),
  চাঁদপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২

- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ
  মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **আল আমিন লাইব্রেরী,** ২/৩ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
  মোবা: ০১৭১০৮৯০১৮২।
- ❑ **বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী**, ৪৬,৪৭ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট
  মোবা: ০১৩০৫৮১৩১১৬।
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ,
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮।
- ❑ **রহমানিয়া লাইবেরী,** নতুন পৌরসভা রোড, হবিগঞ্জ, মোবা. ০১৭১৬৩২২৯৭৬।
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০।
- ❑ **বইঘর,** প্রেস ক্লাব মোড়, মৌলভীবাজার, মোবা. ০১৭১৩৮৬৪২০৮।

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী,
  মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২
- ❑ **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর,
  মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০